পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার

এবং

রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, ২০১২

প্রদান উপলক্ষে

স্মারকগ্রন্থ

রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই

সূচিপত্র

সম্পাদকের নিবেদন ॥ ৫

প্রাক্-কথন ॥ শ্যামাশিস ভট্টাচার্য ॥ ৭

সবিনয় নিবেদন ॥ রমানাথ ভট্টাচার্য ॥ ৯

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ : সংক্ষিপ্ত জীবনী ॥ ১১

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মারক বক্তৃতা

সমাজ-সংস্কার ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের অবদান ॥ অমলেন্দু চক্রবর্তী ॥ ১২

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস : সংক্ষিপ্ত জীবনী ॥ ২৫

রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতা : প্রতিবাদের দলিল ॥ সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় ॥ ২৬

দুটি কবিতার শ্রদ্ধার্ঘ্য ॥ ৪২

রবীন্দ্রনাথ ও পদ্মনাথ : নৃপেন্দ্রলাল দাশ ॥ ৪৩

২০১০ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত অজিৎ বরুয়া ॥ ৪৭

২০১০ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য ॥ ৪৮

২০১১ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত হীরেন ভট্টাচার্য ॥ ৪৯

২০১১ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত পবিত্র মুখোপাধ্যায় ॥ ৫০

২০১২ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক নীলমণি ফুকন ॥ ৫১

২০১২ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক তরুণ সান্যাল ॥ ৫২

বানিয়াচঙের রাজবংশ : পরিবর্ধিত কুলপঞ্জি ॥ সংকলন : রমানাথ ভট্টাচার্য ॥ ৫৩

মতামত ॥ ৫৮

সম্পাদকের নিবেদন

এই স্মারকগ্রন্থের সমস্ত রচনাই যেহেতু বাংলাভাষায় প্রকাশিত সেহেতু গত বছরের মতো এবারও এটি সম্পাদনাকালে অসমিয়া শব্দে আমরা বাংলা হরফ ব্যবহার করেছি। তবে বাংলায় অন্তঃস্থ ব-এর পৃথক রূপ না-থাকায় অসমিয়া উদ্ধৃতিগুলিতে অন্তঃস্থ ব(ৱ)-এর জায়গায় কোথাও প্রচলন অনুযায়ী 'ব' বা 'য়' এবং কোথাও কোথাও মূল অসমিয়া উচ্চারণ বজায় রাখার জন্য 'অ' বা 'ওঅ' ব্যবহৃত হয়েছে। আর শংকরদেবের সময়কার অসমিয়া এবং প্রাচীন বাংলায় মিল এতটাই বেশি যে 'ঘোষা', 'বরগীত' প্রভৃতির ভাষা বাঙালি পাঠকেরও বুঝতে অসুবিধা হবে না বিবেচনায় সেগুলোর বঙ্গানুবাদের বাহুল্য বর্জন করা হল।

পুরস্কৃত কবিদের সচিত্র পরিচয় সংবলিত আলাদা ফোল্ডারের পরিবর্তে এবার বর্তমান বছরের দুজন সহ মোট তিন বছরের ছয়জন পুরস্কৃত কবিরই সচিত্র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি স্মারকগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তা ছাড়া অনেকের কাছ থেকে সদর্থক সাড়া পাওয়ায় এবারকার 'মতামত' বিভাগটি যথেষ্ট স্ফীত। আশা করি, এই ধারা আগামী বছরগুলিতেও অব্যাহত থাকবে।

ইতিপূর্বে প্রকাশিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এবং রামনাথ বিশ্বাসের জীবনীমূলক রচনা দুটির পরিবর্তে এবার তাঁদের সংক্ষিপ্ত সচিত্র পরিচিতি স্মারকগ্রন্থে স্থান পেয়েছে। শ্রী নৃপেন্দ্রলাল দাশের পদ্মনাথ বিষয়ক নিবন্ধটি বাংলাদেশ থেকে সংগৃহীত।

ফাউন্ডেশনের সভাপতি শ্রী রমানাথ ভট্টাচার্য সংকলিত বানিয়াচং রাজবংশের কুলপঞ্জিটি এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিল, সে-কারণে সামান্য সংশোধন সহ সেটি পুনর্মুদ্রিত হল।

প্রতিটি রচনা সম্পাদনার সময় আধুনিক বানানরীতি অনুসরণ করেছি, তবে উদ্ধৃতিগুলিতে মূল বানান অবিকৃত রাখা হয়েছে। স্মারকগ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে এ-বছরও ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষের, বিশেষত রমানাথ ও শ্যামাশিস ভট্টাচার্যের নিরন্তর সহযোগিতা ও সহায়তা পেয়েছি, এ-কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করি। এবার সম্পাদনাকার্যে সহযোগিতার জন্য শ্রী বাসব রায়কে ধন্যবাদ।

প্রাক্-কথন

আমার বাবা রমানাথ ভট্টাচার্য নিজে একজন কবি, একই সঙ্গে অন্যের কবিতার প্রতিও রয়েছে তাঁর গভীর ভালোবাসা। এককথায়— তিনি কবিতা-অন্ত-প্রাণ। আবার, আমাদের দুই স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ এবং ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে তাঁর জীবন, চিন্তাধারা ও কাজের মধ্যে। অসমিয়া ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি বাবার অসীম অনুরাগের মূলেও পদ্মনাথের পঁচিশ বছরের শ্রমের ফসল 'কামরূপশাসনাবলী'-কে চিহ্নিত করা যায়। অনুরূপ ভালোবাসা থেকেই বাবা ১৯ জন অসমিয়া কবির ৮৯টি কবিতা বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন 'আধুনিক অসমিয়া কবিতা' এবং নীলমণি ফুকনের ৫১টি অনূদিত কবিতার সংকলন 'পড়োশি গোলাপ'। অন্যদিকে রামনাথ বিশ্বাসের সংস্কারমুক্ত সংগ্রামী জীবন ও বিশ্বপর্যটনের অভিজ্ঞতা বাবার মনে বুনে দিয়েছে উদারতার বীজ।

এইসব কারণে, বাবার নামে আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন গঠনের পরে অসমিয়া ও বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা এবং উল্লিখিত দুই পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে প্রতিবছর পদ্মনাথ-রামনাথ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর কবিতার প্রতি বাবার বিশেষ অনুরাগের কথা মনে রেখে এটাও স্থির করা হয় যে পুরস্কার দুটি দেওয়া হবে অসমিয়া ও বাংলা ভাষার দুজন কবিকে— তাঁদের জীবনজোড়া সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ।

এই ফাউন্ডেশনের মুখ্য উপদেষ্টা কবি-সাংবাদিক সুকুমার বাগচি আমাদের অনুরোধে পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থটি সম্পাদনার দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। সেজন্য তাঁকে জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা।

আমরা চাই, বাংলা ও অসমিয়া ভাষা-সংস্কৃতি হাতে হাত ধরে চলুক। পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠানের সূচনাতেও তাই মহাপুরুষ শংকরদেবের বরগীতের সঙ্গে রাখা হয়েছে আমাদের অন্য এক স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ স্বামী চণ্ডিকানন্দ মহারাজ রচিত একটি সুপরিচিত ভক্তিগীত। কামনা করি, সম্প্রীতির বাতাবরণে সকলের জীবন সুস্থ ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক।

শ্যামাশিস ভট্টাচার্য
সাধারণ সচিব
রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই

গুয়াহাটি,
১৭ মার্চ, ২০১৩

সবিনয় নিবেদন

আমার নামে মুম্বাইয়ে একটি ফাউন্ডেশন গঠিত হয়েছে। অন্যান্য কয়েকটি করণীয় কাজের সঙ্গে এই ফাউন্ডেশনের প্রধান উদ্দেশ্য আমার ঘনিষ্ঠ দুই স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ (সম্পর্কে আমার পিতা রমণীমোহনের জ্যেষ্ঠতাত) এবং ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের (সম্পর্কে আমার বাবার জ্যাঠতুতো দাদা) স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ প্রতিবছর দুটি সাহিত্য-পুরস্কার প্রদান। প্রতিটি পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫১,০০০ টাকা, সেইসঙ্গে একটি স্মারক ও মানপত্র। পদ্মনাথের নামাঙ্কিত স্মৃতিপুরস্কারটি দেওয়া হচ্ছে অসমিয়া ভাষার একজন বিশিষ্ট কবিকে এবং রামনাথের নামাঙ্কিত স্মৃতিপুরস্কারটি দেওয়া হচ্ছে বাংলা ভাষার একজন বিশিষ্ট কবিকে। দুটি পুরস্কারপ্রাপকের নাম নির্বাচনের ব্যাপারে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ সম্লিষ্ট কবিদের সারাজীবনের কাব্যকৃতির উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন।

প্রতিবছর মার্চ-এপ্রিল মাসে গুয়াহাটিতে পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেইসঙ্গে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে প্রতিটি পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠানে অসমিয়া ও বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রের নির্দিষ্ট বিষয়ে ভাষণ দেবেন দুজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব এবং স্মারক বক্তৃতা দুটির বিষয় নির্ধারণ করবেন ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ। সেই অনুযায়ী ২০১০ সালের জন্য ২০১১-এর ১৩ মার্চ আয়োজিত পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠানে পদ্মনাথ ও রামনাথ স্মারক বক্তৃতা দিয়েছিলেন যথাক্রমে শ্রী হরেকৃষ্ণ ডেকা ও শ্রী তরুণ মুখোপাধ্যায়। আর গতবছর ২৫ মার্চের অনুষ্ঠানে বক্তা ছিলেন যথাক্রমে শ্রী বীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং শ্রী বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য।

২০১২ সালের পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত আজকের এই অনুষ্ঠানে স্মারক বক্তৃতা দিচ্ছেন শ্রী অমলেন্দু চক্রবর্তী এবং শ্রী সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়। এবার প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থে শ্রীচক্রবর্তী ও শ্রীমুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতা দুটি মুদ্রিত হল।

২০১২ সালের জন্য পদ্মনাথ স্মৃতিপুরস্কার এবং রামনাথ স্মৃতিপুরস্কার ফাউন্ডেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তুলে দেওয়া হচ্ছে যথাক্রমে কবি নীলমণি ফুকন এবং কবি তরুণ সান্যালের হাতে। তাঁদের সম্মান জানাতে পেরে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষ বিশেষ সন্তুষ্টি অনুভব করছেন।

রমানাথ ভট্টাচার্য
সভাপতি
রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই

গুয়াহাটি,
১৭ মার্চ, ২০১৩

পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ

(১৮৬৮-১৯৩৮)

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের জন্ম অবিভক্ত অসমের শ্রীহট্ট জেলায় হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বানিয়াচঙে, ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দের ৫ অক্টোবর (২১ ভাদ্র ১২৭৫ বঙ্গাব্দ)। বানিয়াচং রাজবংশের সন্তান পদ্মনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় অসম রাজ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। তিনি ১৮৯০ সালে ইংরেজি, সংস্কৃত ও দর্শনে অনার্স সহ বি.এ. পাশের পর সাফল্যের সঙ্গে সংস্কৃত পাঠক্রম সমাপ্ত করে ঢাকা সারস্বত সমাজ কর্তৃক 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধিতে ভূষিত হন। ১৮৯২ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেন।

অসমের উজ্জ্বল রত্ন পদ্মনাথের কর্মজীবন শুরু হয় শিলঙে, ১৮৯৩ সালের ১০ নভেম্বর, রাজ্য সচিবালয়ের কর্মচারী হিসাবে, সেখানে তিনি সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গবেষণার কাজে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সুরমা উপত্যকার ডেপুটি ইনস্পেক্টর অব স্কুল্স-এর কার্যভার গ্রহণের জন্য তিনি ১৮৯৭ সালের ১ জানুআরি শিলং ত্যাগ করেন। সিলেটে বাসকালে তিনি নিজ উদ্যোগে প্রচুর ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করে তুলে দেন অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধির হাতে, যিনি ওইসব তথ্যের ভিত্তিতে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' প্রকাশ করেন পদ্মনাথের আর্থিক সহায়তায়।

যদিও পদ্মনাথ সিলেটের বিখ্যাত মুরারিচাঁদ কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনা করেছিলেন, ১৯০৫ সালের জুন মাসে ইতিহাস ও সংস্কৃতের শিক্ষক হিসাবে গুয়াহাটির কটন কলেজে যোগদানের পরে তিনি বিশেষভাবে ভাষা, সাহিত্য ও ঐতিহাসিক গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। ১৯২৩ সালে অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত কটন কলেজে থাকাকালীন তিনি এক ডজনেরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যার মধ্যে 'হেড়ম্ব রাজ্যের দণ্ডবিধি', 'কামরূপশাসনাবলী' এবং 'মি. গেইট্'স হিস্টরি অব আসাম' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরই নেতৃত্বে ১৯১২ সালের ৭ এপ্রিল গুয়াহাটিতে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' (আসাম রিসার্চ সোসাইটি)। অসমের ঐতিহাসিক গবেষণার ক্ষেত্রে 'কামরূপশাসনাবলী' নিঃসন্দেহে পথিকৃৎ এবং এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। তিনি বেশ কয়েকটি সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেছেন এবং 'অসম সাহিত্য সভা'-র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ছিলেন। তাঁর সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯২২ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার পদ্মনাথকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করে, তবে 'অশাস্ত্রীয়' সারদা আইনের প্রতিবাদে এই খেতাব তিনি ফিরিয়ে দেন।

শেষজীবনে পদ্মনাথ কাশীবাসী হন এবং কাশীধাম ব্রাহ্মণ সভা থেকে 'সমাজ হিতকর গ্রন্থমালা'-র অন্তর্গত তাঁর দুটি বই ('আলোচনা চতুষ্টয়' ও 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ') প্রকাশ পায়। ❑

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মারক বক্তৃতা

সমাজ-সংস্কার ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শংকরদেবের অবদান

অমলেন্দু চক্রবর্তী

উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষে শংকরদেবের আবির্ভাব একটি যুগান্তকারী ঘটনা। বস্তুত ভারতবর্ষের এই পূর্বপ্রান্তে শংকরদেব আমাদের জাতীয় জীবনকে আধুনিকতার পথে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে এখানে উপস্থাপিত করতে পারি। "From a land of primitive Animism which was being affiliated to Saivism and the Saktism of the Tantras, Sankaradeva and Madhavadeva transformed Assam into a country of advanced humanism."[১] মধ্যযুগের অসমভূমিতে শংকরদেবের আবির্ভাব কোনো আকস্মিক ঘটনামাত্র ছিল না। মধ্যযুগে ভারতবর্ষে যে-ভক্তি আন্দোলন আসমুদ্র হিমাচলে এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল, পূর্বভারতে শংকরদেবের আবির্ভাব ছিল তারই ফলশ্রুতি; সর্বভারতীয় এই আন্দোলনকে অনেকে একান্তই 'ধর্মীয় আন্দোলন' হিসাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন; কিন্তু আসলে এই আন্দোলন কেবল ধর্মীয় আন্দোলন মাত্র ছিল না— এ ছিল একই সঙ্গে সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক জীবনকে কেন্দ্র করে একটি জাতীয় নবজাগরণ। এই আন্দোলন সম্পর্কে বলা হয়েছে— "It was not a purely religious movement. The Vaishnavite doctrines were essentially the idealist manifestations of the Socio-economic realities of the times. It expressed itself in the cultural field as a national renaissance."[২] এই আন্দোলন সত্য, নীতি, কল্যাণ, সৌন্দর্যস্পৃহাকে অবলম্বন করে,[৩] ধর্মীয়, আর্থিক ও সামাজিক জীবনে যুগসঞ্চিত ভাষা-বর্ণ ও অর্থহীন ধর্মীয় আচারের সমস্ত রকম আধিপত্যবাদের (authoritarianism) বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চার করেছিল। রাষ্ট্রপূজা ও দেবদেবীর পূজা থেকে শুরু করে সমস্ত ঐশ্বর্যের বিরুদ্ধে ছিল এর বিদ্রোহ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "...সে ভগবানকে তাঁহার রাজসিংহাসন হইতে আপনাদের খেলাঘরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছিল, এমন-কি প্রেমের স্পর্ধায় সে ভগবানের ঐশ্বর্যকে উপহাস করিয়াছিল।"[৪]

এ-জন্যই পূর্বভারতের সমাজ-সংস্কার ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শংকরদেবের অবদান সম্পর্কে আলোচনা একান্তই প্রাসঙ্গিক। একদিকে শবরস্বামী এবং কুমারিল ভট্টের মীমাংসা দর্শন যা ঈশ্বরকে গৌণ করে[৫] বেদের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য থেকে ভ্রষ্ট যজ্ঞ ইত্যাদি কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনকেই মুক্তির উপায় বলে যখন প্রচার করছিল; অপরদিকে শংকরাচার্য যখন বেদ উপনিষদের দ্বারা অস্বীকৃত কেবলাদ্বৈতবাদের[৬] আশ্রয়ে নীতি, প্রেম, ভগবদ্ভক্তি, ঈশ্বরোপাসনা এমন-কি ঈশ্বরের পারমার্থিক মূল্যকে অস্বীকার করে[৭] নির্বিশেষ ব্রহ্মকে একমাত্র সত্য[৮] এবং

জগৎকে মিথ্যা বলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক নঞর্থক (Negative) দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছিলেন[৯] তখনই ভারতবর্ষে এর বিরুদ্ধে ভক্তি-আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, এই আন্দোলন একমাত্র ঈশ্বরের প্রতি অহৈতুকী ভক্তি নিবেদনের আদর্শ প্রচার করে জগৎ সম্পর্কে এক সদর্থক (Affirmative) জীবনবোধের পরিচয় তুলে ধরেছিল। ভারতীয় ধর্মদর্শনের ইতিহাসে এই আন্দোলন এক 'Practical Spiritual philosophy'-র জন্ম দিয়েছিল এবং তা উপনিষদের 'naive philosophical mysticism' থেকে 'practical devotional mysticism'-এর দিকে অগ্রসর হয়েছিল। এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য "...consisted in mixing with the ordinary run of mankind, with sinners, with pariahs with women, with people who cared not for the spiritual life, with people who had even mistaken notions about it, with in fact, everybody who wanted, be it every so little, to appropriate the Real."[১০]

যে-ভক্তি আন্দোলন সেদিন ভারতবর্ষে জনজীবনের তৃণমূল স্তর পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়েছিল তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল, "...first, recognition of the unity of the people irrespective of religious considerations, secondly, equality of all before God; thirdly, opposition to the Caste system, fourthly, the faith that communion between God and man depended on the virtues of each individual, and not on his wealth or caste, fifthly, emphasis on devotion as the highest form of worship, and finally, denigration of ritualism, idol-worship, pilgrimages, and all self mortifications."[১১]

অসমে শ্রীমন্ত শংকরদেব আনীত এই আন্দোলনে উক্ত সব কয়টি বৈশিষ্ট্যই আমরা লক্ষ করেছি যেগুলো সমাজকে ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে এক আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করেছিল। সমস্ত ধরনের সাম্প্রদায়িক অনাচার-অবিচার এবং মানসিক দরিদ্রতার বিরুদ্ধে আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় আচরণের ক্ষেত্রে সর্ববর্ণের সমান অধিকারের বিষয় সামনে রেখে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তির সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে যে-আন্দোলন সেদিন ভারতীয় জীবনে নবজাগরণের সূচনা করেছিল তারই প্রাণপুরুষ ছিলেন শ্রীমন্ত শংকরদেব। 'বামানয় শাস্ত্র'-মোহিত ভারতবর্ষের এই পূর্বপ্রান্তে কেবল সাধ্য-সাধনতত্ত্ব রচনা কিংবা তার ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে নয়, স্ত্রী-শূদ্ররা যাতে বুঝতে পারে সেই দেশীয় ভাষায় ভাগবত ইত্যাদি সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদ তথা সেইসঙ্গে শিল্প-কলা-সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বকীয় প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে তিনি ভক্তিরসের নির্মল প্রবাহে জাতি-উপজাতি-জনজাতির মধ্যে যে-সমস্ত বৈষম্য বর্তমান সেগুলো নিশ্চিহ্ন করার এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। দেশীয় ভাষায় তাঁর ভাগবত অনুবাদ ছিল নিঃসন্দেহে হাজার হাজার বৎসরের শাস্ত্রীয় নির্দেশের বিরুদ্ধে এক সুদৃঢ় পদক্ষেপ। কেননা আমাদের দেশে শাস্ত্রবাক্যের ভয় দেখিয়ে বলা হয়েছিল—

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানি চ
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।।'

অর্থাৎ, অষ্টাদশ পুরাণ এবং রামের চরিত-কথা মানুষের ভাষায় অর্থাৎ মাতৃভাষায় শ্রবণ করলে রৌরব নামক ভয়ংকর নরকে যেতে হবে। শংকরদেব শুধু এই শাস্ত্রবাক্যকেই লঙ্ঘন করলেন না, 'কৃষ্ণস্য বাঙ্ময়ী বিগ্রহ' ভাগবতের কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদে ভাগবতে অনুল্লেখিত পূর্বভারতের কিছু জনজাতির নাম ব্যবহার করে জাতীয় সংহতির এক স্বাক্ষর তুলে ধরলেন। মূল ভাগবতে ছিল :

কিরাত হূনান্ধ্র পুলিন্দ পুক্কসা
আভীর কঙ্কা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽনো চ পাপা যদু পাশ্রয়াশ্রয়াঃ
শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ।। (ভা. ২/৪/১৮)

এই অংশের অনুবাদে শংকরদেব লিখলেন —

কিরাত কছারী খাচি গারো মিরি
যবন কঙ্ক গোআল।
অসম মুলুক ধোআ যে তুরুক
কুবাচ ম্লেচ্ছ চণ্ডাল।।
আনো পাপী নর কৃষ্ণ সেবকর
সঙ্গত পবিত্র হয়।
ভকতি লভিয়া সংসার তরিয়া
বৈকুণ্ঠে সুখে চলয়।।

উল্লেখ্য, কৃষ্ণের বাঙ্ময় বিগ্রহ শ্রীমদ্ভাগবতে ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তের এইসব অবহেলিত জাতির নাম উল্লেখ করে এবং নামঘরে দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে ভাগবত গ্রন্থ স্থাপন করে

তিনি এই জাতিদেরও সম্মানিত করেছিলেন। সেদিন থেকে কৃষ্ণের বাম্বায় বিগ্রহে অলংকারস্বরূপ শোভিত হয়ে নামঘরে আশ্রয় পেয়েছেন তাঁরা। স্বয়ং ধর্মীয় প্রবক্তা হয়ে হিন্দুধর্মের এইসব নেতিবাদী শাস্ত্রবাক্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা শংকরদেব কোথা থেকে অর্জন করেছিলেন এ-প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। অবশ্যই এই নৈতিক শক্তি ভক্তি-আন্দোলনের পটভূমিতেই নিহিত ছিল। এ-বিষয়ে আলোকপাত করতে হলে আমাদের অবশ্যই প্রসঙ্গান্তরে যেতে হবে।

ভক্তি-আন্দোলনের পটভূমি আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বিশ্বসংস্কৃতির আলোকে ভারতীয় সংস্কৃতিকে দুটি ধারায় বিভক্ত করতে চাই। এর মধ্যে একটি হচ্ছে সৌর সংস্কৃতি এবং অপরটি চান্দ্র সংস্কৃতি। আসলে যারা কৃষিজীবী সম্প্রদায় তারা কৃষিকর্মের সুবিধার জন্যই অনিবার্যভাবে সূর্যের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তাই কৃষিপ্রধান অঞ্চলের সংস্কৃতি সূর্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল প্রবলভাবে। অপরদিকে যে-সব অঞ্চল কৃষিকার্যের পক্ষে ছিল অনুপযোগী সেখানে সূর্যের ভূমিকা ছিল গৌণ, চন্দ্রের ভূমিকা ছিল মুখ্য। ওইসব অঞ্চলের জনগোষ্ঠী মূলত ছিল শস্যের সংগ্রাহক (Food gatherer), শস্যের উৎপাদক (Food producer) নয়। ফলে এরা হয়ে উঠেছে ক্ষমতার পূজারি এবং যথার্থ অর্থে শোষণজীবী বা শক্তিজীবী সম্প্রদায়। এভাবে মানব সভ্যতার প্রায় সর্বত্র গড়ে উঠেছে দুটি সম্প্রদায়। প্রখ্যাত মনীষী রুডল্‌ফ রকারের সংস্কৃতি ও জাতিবাদের প্রসঙ্গে কৃত একটি মন্তব্যের সারসংক্ষেপ এখানে উদ্ধৃত করতে পারি। তাঁর মতে, মানুষের ইতিহাসে সূচনালগ্ন থেকেই দুটি বিরোধী প্রবণতার সংগ্রাম দেখা যায়, "সম্পদের উৎপাদন বনাম ক্ষমতার পূজা; মুক্তির স্পৃহা বনাম শক্তির লালসা, সমবায়ী চেতনা বনাম যূথবৃত্তি, সংস্কৃতি বনাম রাজনীতি ও ধর্ম।"[১২] একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রবণতাই হচ্ছে ক্ষমতার ধর্ম। এই প্রবণতা থেকেই পুরোহিত সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রশক্তির উদ্ভব।

এই দুই ধারাকে অবলম্বন করে দুটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছিল। যারা ছিল কৃষিজীবী সম্প্রদায়, শস্যের উৎপাদক তারা সূর্যের ওপর নির্ভর করেছিল, অপরদিকে যারা ছিল শস্যের সংগ্রাহক, ক্ষমতার পূজারি তারা চান্দ্র সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছিল। এই দুই সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত সভ্যতার গোড়া থেকেই লক্ষ করা যায়। এ-প্রসঙ্গে বার্ট্রান্ড রাসেলের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। "There has been a curious conflict ... between luner and solar priesthoods and luner calendars. The calendar has at all times played an important part in religion..... The very inaccurate lunar calendars were everywhere advocated by priests devoted to the worship of the moon, and the victory of the solar calendar was slow and partial. In Egypt, this conflict was at one time a source of civil war. ... Although it is rash to attribute any degree of rationality to primitive civilization, it is nevertheless difficult to resist the conclusion that the victory of the sun worshippers, wherever it occured, was due to the patent fact that the sun has more influence than the moon over the crops." [১৩]

এই দুই সংস্কৃতির মধ্যে যে-সংঘাত তার আলোকে আমরা ভারতবর্ষের ধর্মীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিবর্তনকে এখানে তুলে ধরতে পারি। প্রাচীন ভারতবর্ষে আর্যরা ছিলেন মূলত কৃষিজীবী সম্প্রদায়। এ-প্রসঙ্গে 'The Discovery of India' গ্রন্থে জওহরলাল নেহরু 'আর্য' শব্দটি কৃষিবাচক বলে মন্তব্য করেছেন, "The word 'Arya' comes from a root meaning to till, and the Aryans as a whole were good agriculturists and agriculture was considered a noble profession."[১৪] একই চরিত্র লক্ষ করা গেছে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী গ্রিক ও ইতালীয়দের মধ্যেও : "... Free peasants such as had formed the backbone of the classical Greece and early Italy."[১৫] এমন-কি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর আদি উৎস ছিল এই কৃষিজীবী সমাজই।[১৬] ফলে স্বভাবতই আর্যদের মধ্যে সৌরসংস্কৃতি প্রাধান্যলাভ করেছিল। বস্তুত আর্যরা ছিলেন জ্যোতির সন্তান, আলোকের অগ্রদূত— 'জ্যোতিরগ্রাঃ' (ঋগ্‌বেদ ৭/১৩/৭)। তাঁরা আলোকের পথে সত্যের চিরপথিক— 'জ্যোতিশ্চক্রথুরার্যায়'।[১৭] সূর্য তাই আর্য-চেতনার প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে। ঋক্‌সংহিতার সর্বানুক্রমণীকার কাত্যায়ন বলেছেন,

বৈদিকদের একটি দেবতা— তিনি সূর্য। "কাত্যায়নের মতে বেদের সকল দেবতাই সূর্যের বিভিন্ন রূপ মাত্র। তাঁর উক্তি 'এক এব মহানাত্মা বেদে স্তূয়তে স সূর্য ইতি ব্যাচক্ষতে'।"১৮ এই কৃষি ও সূর্যকেন্দ্রিক সংস্কৃতির ধারাতেই কৃষ্ ধাতুজাত কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে গো-কেন্দ্রিক মানসিকতার উদ্ভব। একই ভাবে ইউরোপের ইতিহাসেও খ্রিষ্টের মধ্যে এমনই এক সদর্থক মানসিকতা জন্ম নিয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে আমরা D.H. Lawrence-এর একটি মন্তব্য অনুধাবন করতে পারি। "The gentle cow which supports our life. Even the mother of Jesus had with her in the stable the cows of peace and plenty, when Jesus was born."১৯

কিন্তু ভারতবর্ষে আর্যভাষী সমাজের মধ্যেই সৃষ্টিজীবী সম্প্রদায়ের বিপরীতে একদল nomadic সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে প্রধান হয়ে উঠেছিল। শক্তিজীবী এই জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ইন্দ্র। ইন্দ্রই ছিলেন ভারতবর্ষে আগত প্রথম আক্রমণকারী দলের নেতা। ইন্দ্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Indra is a symbol of a later wave of Aryan invaders and immigrants who came into India, on one hand, and reached the Middle-east, on the other. It is these Aryans who put an end to the culture maturing in the Punjab."২০ ইন্দ্র আসার আগেই ভারতে আর্য সভ্যতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।২১ ইন্দ্র ছিলেন মূলত যুদ্ধজীবী নর্ডিক আর্য গোষ্ঠীর নেতা, "The Nordic Aryans who invaded India Between 1500-1200 B.C. were a nomadic warlike people."২২

অতঃপর ভারতীয় জীবনধারা স্পষ্টত দু-ভাগে বিভাজিত হয়ে গেল। একদিকে বরুণ-বিষ্ণু-কৃষ্ণের জনমুখী শস্য-উৎপাদনকারীদের ধারা, অপরদিকে ইন্দ্রের দমনপন্থী শক্তিজীবী আহারসংগ্রহকারীদের ধারা। কৌশীতকি উপনিষদে ইন্দ্রের স্বভাবের যে-বর্ণনা রয়েছে তা আমাদের মতের অনুকূলে সাক্ষ্য বহন করে। সেখানে ইন্দ্রের বাচনিক দিবোদাসের ছেলে প্রতর্দনের উদ্দেশে উক্ত হয়েছে, "ত্বষ্টার ছেলে ত্রিশীর্ষকে আমি হত্যা করিয়াছি। অরুমর্গ নামক যতিকে আমি কুক্কুর দ্বারা ভক্ষণ করাইয়াছি। যুদ্ধের অনেক সন্ধি ভঙ্গ করিয়া আমি দিবালোকে প্রহ্লাদের অনুচরদিগকে, অন্তরীক্ষে পৌলোমদিগকে এবং পৃথিবীতে কালকাশ্যদিগকে বধ করিয়াছি। এইসব কাজ করিতে আমার একটি কেশও বাঁকিয়া যায় নাই। যে আমাকে এই ভাবে জানিবে, সে যদি মাতৃবধ, পিতৃবধ, চুরি, ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি মহাপাতকও অতীতে করিয়া থাকে, তবু তাহার মনে কিছুমাত্র অনুশোচনা হইবে না, অথবা বর্তমানেও এই সব পাপ করিবার সময় তাহার মনে কোনো দুঃখ হইবে না, অথবা তাহার মুখের উজ্জ্বলতা কিছুমাত্র কমিয়া যাইবে না।"২৩

এখানে লক্ষণীয়, শক্তিজীবী যুদ্ধজীবী ইন্দ্রের ধারায় ন্যায়ের, সত্যের, ঋতের কোনো সম্পর্ক ছিল না; অপরদিকে কৃষিজীবী বরুণ-বিষ্ণুর ধারায় ঋতের ধারণা প্রধান। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এই দুই ধারার মধ্যে একটি সংঘাতের চিত্র ক্রমান্বয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সংঘাতের চিত্র প্রথম লক্ষ করা যায় ঋগ্বেদের কয়েকটি মন্ত্রে২৪ এবং বিস্তারিত ভাবে শ্রীমদ্ভাগবতে। বস্তুত নীতিরহিত শক্তিজীবীদের বিরুদ্ধে সত্য, ঋত তথা যুক্তিকে অবলম্বন করে কৃষ্ণের সংঘাত ভাগবতে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কৃষির সুবিধার্থে জলের জন্য ইন্দ্রের পূজা করা হয়, নন্দ প্রভৃতি বৃদ্ধদের মুখে এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্র পূজার বিরোধিতা করে বলেছেন—

রজসা চোদিতা মেঘা বর্ষত্যম্বূনি সর্বতঃ।
প্রজাস্তৈরেব সিধ্যন্তি মহেন্দ্রঃ কিং করিষ্যতি ।।

(ভাগবত ১০। ২৪।২৩)

অর্থাৎ, 'প্রকৃতির স্বভাবেই মেঘ হয় এবং মেঘ সর্বত্র বারি বর্ষণ করে, তাতেই জীব বাঁচে। এখানে মহেন্দ্রের কিছু করার নেই।' ঋতের সহায়তায় শাস্ত্রের আধিপত্য এভাবেই কৃষ্ণ খর্ব করেছিলেন।২৫

ভারতবর্ষের ইতিহাসে গুপ্তযুগ থেকে এই কৃষিবিরোধী শক্তিজীবী শোষণপন্থীদের ধারা প্রাধান্যলাভ করে। এই ধারায় পুরোহিত তন্ত্রের আবির্ভাব এবং সেইসঙ্গে বিভিন্ন শক্তি-দেবদেবীর অনুপ্রবেশ ঘটে। "At the end of the Gupta period goddesses rose to prominence, together with magical cults, religious sexuality and a new form of animal sacrifice, which increased in

importance throughout the early Middle ages."[২৬]

নবোদ্ভূত এই আচারকেন্দ্রিক পুরোহিত সম্প্রদায়ের সঙ্গে বেদের ঋষিকবিদের পার্থক্য ছিল ব্যাপক— "The character and functions of these new ritual priests were obviously different from those of the poet-priests."[২৭] এই আচারকেন্দ্রিক পুরোহিত ব্রাহ্মণরা ছিলেন মূলত আধিপত্যবাদী।[২৮] বস্তুত কৃষিজীবী বা ফসল-উৎপাদনকারীদের বিরুদ্ধে পুরোহিত সম্প্রদায়ের সক্রিয়তা তাঁদের শোষণজীবী চরিত্রকেই প্রতিষ্ঠিত করেছিল।[২৯] নীতির সঙ্গে এঁদের কোনোদিনই সম্পর্ক ছিল না অথবা জনসাধারণের নৈতিক উন্নতির দিকেও এঁরা কোনোদিনই নজর দেননি।[৩০] শুধু তা-ই নয়, ইতিহাসবিদের বিচার অনুযায়ী ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আবির্ভাব যে-কোনো বিদেশী আক্রমণের চেয়ে ছিল মারাত্মক— "far deadlier than any invasion."[৩১] কারণ সামন্তবাদের দ্বারা পুষ্ট হয়ে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগৎকেও সংকীর্ণ করে এনেছিল।[৩২] এঁদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল (চতুর্থ শতাব্দী) থেকে শুরু করে অদ্বৈতবাদী শংকরাচার্য পর্যন্ত (নবম শতাব্দীর প্রারম্ভ) ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রবল হয়ে উঠেছিল। শূদ্রদের লাঞ্ছনা করার জন্য শংকরাচার্য যে-সব শাস্ত্রবচনের সাহায্য নিয়েছিলেন, সেই গৌতমধর্মসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ গুপ্তরাজাদের সময়েই লিখিত হয়েছিল।[৩৩] আসলে লাঙল-বিরোধী এই স্মার্ত ব্রাহ্মণরা জগৎ ও জীবনের প্রতি একটি নঞর্থক ধারণাকেই ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।[৩৪] এ-ক্ষেত্রে মায়াবাদী শংকরাচার্যের ভূমিকা ছিল অন্যতম।

অতঃপর ভারতবর্ষে সাংস্কৃতিক সংঘাত শুরু হল কৃষি ও সূর্যকেন্দ্রিক বিষ্ণু-কৃষ্ণ বনাম জাদুমুখী কৃষি-বিরোধী চন্দ্রকেন্দ্রিক শিব-শক্তির মধ্যে। একদিকে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কৃষিজীবী শূদ্র-বৈশ্য-ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়, অন্যদিকে সামন্ত প্রভু ও পুরোহিত ব্রাহ্মণের দল; শিব ও শক্তিই ছিল তাঁদের একমাত্র আরাধ্য। "The real underlying struggle is known to have been between the great feudal landlords who worshipped Siva and his consort goddess as against the smaller but more enterprising entepreneurs who opted for Krishna or Vishnu-Narayana."[৩৫] এ-সম্পর্কে আরও বলা হয়েছে, "Siva had then become the god of the great barons, whereas the cowherd boy Krishna remained associated with small producers."[৩৬] একনায়কত্ববাদী সামন্ত প্রভু এবং কৃষিবিরোধী জাদুমুখী ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাঁদের আদর্শের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন ভীতিপ্রদ শিব তথা শক্তিদেবীদের মধ্যে। কেননা, "...Siva has a rather ferocious and dangerous side to his character. Vishnu is generally thought of as wholly benevolent. The god works continuously for the welfare of the world."[৩৭]

এই নিপীড়নধর্মী গণতন্ত্রবিরোধী ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, মায়াবাদী শংকরাচার্যের নির্বিশেষাদ্বৈতবাদ এবং আচারকেন্দ্রিক বহুদেবদেবীবাদের বিরুদ্ধে সেদিন বৈষ্ণব ভক্তি-আন্দোলন 'সৌন্দর্য-মাধুর্য-চৈতন্য-মানবতার' আলোকে ভারতীয় সমাজের চরম অন্ধকার দূর করার চেষ্টা করেছিল। লক্ষণীয়, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে বিশ্বাসীরা সেদিন সমস্ত ভারতবর্ষে একযোগে এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন। ভক্তি-আন্দোলন শংকরাচার্যের নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদ, ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে সর্বমানবের সম-অধিকার, ঐশ্বর্যের বিরুদ্ধে মাধুর্য, ভীতি সঞ্চারের পরিবর্তে প্রেম এবং সর্বোপরি বিবর্তবাদের বিরুদ্ধে পরিণামবাদের প্রতিষ্ঠা করে জগৎ ও জীবনের প্রতি এক সদর্থক জীবনদর্শনের জন্ম দিয়েছিলেন। এই ধারাতেই অসমে আমরা পেলাম শ্রীমন্ত শংকরদেবকে।

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সূর্যোপাসনার বিশেষ উল্লেখ ও নিদর্শন পাওয়া গেছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণের ১০৯ অধ্যায়ে সূর্য-উপাসনার জন্য কামরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ-ছাড়াও কালিকাপুরাণ, যোগিনীতন্ত্র এবং প্রাচীন অসমিয়া সাহিত্যে কামরূপ যে সূর্যোপাসনার স্থান তার উল্লেখ পাওয়া যায়। অসমের বিভিন্ন স্থানে সূর্যমন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। তেজপুরের স্থাননামটিও 'সৌর তেজপুর' অর্থাৎ সৌর তেজের দ্বারা পূর্ণ নগর থেকেই হয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন।[৩৮] অসমের পূর্ব প্রান্তে স্থিত দিক্করবাসিনীর 'দিক্কর' শব্দের অর্থ হচ্ছে সূর্য। এ থেকে এই রাজ্যের পূর্বাঞ্চলেও যে সূর্য পূজার

প্রচলন ছিল তা জানা যায়।[৩৯] "কন্দলী রাজ্যও সূর্য রাজ্য ছিল। সূর্যের পতাকার নাম ধর্ম। সূর্যের সহস্র নামের একটি নাম হচ্ছে 'ধর্ম কন্দলী'।....'ডবকা' শব্দটি দেবার্কের অপভ্রংশ। দেবার্ক সূর্যরাজ্য।"[৪০] হাজোস্থিত হয়গ্রীব মন্দিরের হয়গ্রীব 'আদিত্য ভট্টারক' নামেও পরিচিত। এই 'ভট্টারক' শব্দের অর্থ রবি। রবিবারকে ভট্টারক বারও বলা হয়।[৪১]

সূর্যের উপাসনা এবং কৃষিকর্মের প্রাধান্যের জন্যই অসমে ভক্তি-আন্দোলন শংকরদেব-মাধবদেবের জীবনকৃতিকে অবলম্বন করে সার্থকতা লাভ করেছিল বলে পণ্ডিত গ্রিয়ার্সন সাহেবও স্বীকার করেছেন। বঙ্গদেশের মতো সামন্ততান্ত্রিক জীবনধারা অসমে প্রাধান্য লাভ করেনি বলেই কালী-দুর্গার পূজা এখানে প্রধান হয়ে ওঠেনি। শংকরদেব মূলত ভাগবতকে অবলম্বন করে যে-বৈষ্ণবধর্ম অসমে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার মূল কেন্দ্রে ছিলেন 'দৈবকীর পুত্র এক কৃষ্ণমাত্র দেব'; ফলত যজ্ঞ ইত্যাদি আচারকেন্দ্রিক যে-ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ধারা হিন্দুধর্মকে পীড়িত করছিল তার বিরোধিতায় একদিন আমরা পৌরাণিক চরিত্র কৃষ্ণকে পেয়েছিলাম, ঐতিহাসিক চরিত্র ভগবান বুদ্ধকেও পেয়েছিলাম। কৃষ্ণই প্রথম যজ্ঞ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন । অঙ্গিরস ঋষি তাঁকে যজ্ঞের একটি সহজ প্রণালি শিখিয়েছিলেন, এই যজ্ঞের দক্ষিণা হচ্ছে তপস্যা, দান, সরলতা (আর্যব), অহিংসা ও সত্যবাদিতা, "অথ যত্তপো দানমার্জবমহিংসা সত্যবচনমিতি তা অস্য দক্ষিণাঃ।" (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৩।১৭।৪-৬) অসমে শংকরদেবও সৌর সংস্কৃতিকেন্দ্রিক ধারায় আবির্ভূত হয়ে চান্দ্র সংস্কৃতির ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ধারার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং ধর্মীয় আচারের অচলায়তন থেকে মুক্তির পথ ঘোষণা করেছিলেন। উল্লেখ্য, শংকরদেব শুধু সামন্ততন্ত্র-সমর্থিত শংকরাচার্যের নঞর্থক জীবনদর্শনের বিরুদ্ধেই নয়, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র-সমর্থিত বহু দেবদেবীর পূজার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়েছিলেন। বস্তুত গুপ্তযুগের পরেই ভারতবর্ষে তন্ত্র ও জাদুমুখী দেবদেবীরা প্রধান হয়ে উঠেছিলেন। এ-ক্ষেত্রে বৈষ্ণবধর্মের যে-প্রতিবাদ সেদিন লক্ষ করা গিয়েছিল তা শংকরদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মেও সমানভাবে বাস্ময় হয়ে উঠেছিল। এই প্রতিবাদ সম্পর্কে আমরা লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করতে পারি— "Vaishnavism checked the elaborate rituals, ceremonials, vratas, fasts and feasts prescribed by Smritis and Puranas for the daily life of a Hindu and also the worship of various deities like the Sun, the Moon, the grahas or planets, etc. enjoined by the priestly Brahmin class for the sake of emoluments and gain. It enjoined the worship of no other deities except God Narayana of Upanishad. ... Devotion to one deity was the teaching of this school... and the object was to enthrone Hinduism once more on its old pedestal, restore it to the ancient purity of the Upanishad days and free it from the non-Aryan influences that had given it a mixture of tantric rituals and worship of many gods."[৪২]

সমাজকে অর্থহীন আচারের বেড়াজাল থেকে, যা কেবলই আমাদের বাঁধে, মুক্তি দেয় না, শংকরদেব সেই নিশ্ছিদ্র যান্ত্রিক আচারের বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে যথার্থ সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। সর্বোপরি উচ্চবর্ণের দোহাই দিয়ে ব্রাহ্মণদের যে-আধিপত্যবাদ সেদিন সমাজে তীব্র হয়ে উঠেছিল তা থেকে সমাজকে বেরিয়ে আসার পথ প্রদর্শন করেছিলেন তিনি।

তাঁর ধর্মীয় নির্দেশের সমস্তই ছিল নীতিভিত্তিক, যেমন—

ক) *সকলো প্রাণীক দেখিবেক আত্মসম।*
উপায় মধ্যত ইটো অতি মুখ্যতম ।।(কীর্তন - ১৮২৫)

খ) *নমারিবে পশুক এড়িবে মাংস-আশা।*
দেবকো উদ্দেশি পশু ন করিবে হিংসা।।
(নিমি নবসিদ্ধ-৩৪৮)

গ) *চণ্ডালো হরিনাম লবে মাত্র।*
করিবে উচিত যজ্ঞর পাত্র ।।(কীর্তন-১১৯)

ঘ) *প্রাণী ভয় ভীত ভৈলে করিবে রক্ষণ।।*
বিশেষত মহন্তর এহি ব্যবহার।
পরজীব রাখে জীব দিয়া আপোনার।।
অভয় দানত পরে ধর্ম নাহি আন।
কোটি অশ্বমেধো তার নুহিকে সমান ।।
(ভাঃ ৮।৩৯৭-৯৮)

সামন্ততান্ত্রিক ধারার সমর্থক[৪৩] ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র ও শংকরাচার্য

ভারতবর্ষের বুকে বর্ণভেদের যে-ঘোড়া হাঁকিয়েছিলেন, শংকরদেব অসমে ভাগবতকে কেন্দ্র করে তার বিরোধিতা করেছিলেন। শংকরাচার্য যে-শূদ্রকে পদযুক্ত শ্মশান বলে পশুর স্তরে নামিয়ে দিয়েছিলেন, সেখান থেকে শংকরদেব ভাগবত গ্রন্থকে ভিত্তি করে সেই শূদ্রদের মানুষের স্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন—

সিটো চাণ্ডালক গরিষ্ঠ মানি।
যার জিহ্বাগ্রে স্রবে হরিবাণী।।

ভাগবতের অনুসরণেই তিনি শূদ্রাণী সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

তীর্থকো পবিত্র করে ইটো কোন্ চিত্র।
তোর দরশনে হয় জগত পবিত্র।।(ভক্তি প্রদীপ-৯৪)

অসমে শ্রীমন্ত শংকরদেবের উদার ও মানবতাবাদী ধর্মমত সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন— "Naturally this went counter to the spirit of traditional Brahmanism based on the notions of caste and of worship through the various manifestations of the Deity."[৪৪] এর ফল হয়েছিল মারাত্মক, একযোগে ব্রাহ্মণরা শংকরদেবের বিরোধিতা করেছিলেন বলেও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন। শুধু তা-ই নয়, "The hostility of the Brahmans and the indifference of the Ahom kings and sometimes their cruelty due to their fear of revolutionary doctrines upsetting the equilibrium of the state Sankardeva's own son-in-law was beheaded at the order of the Ahom king Su-hung-mung made him leave his homeland near town of Nowgong within Ahom territory and seek asylum with the Koch Bihar king Naranarayana."[৪৫]

সমাজ-সংস্কারে শংকরদেবের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল এই ধর্মের গৃহমুখীনতা বা গার্হস্থ্য ধর্মের অসাধারণ স্বীকৃতি। শংকরাচার্যের মতবাদের দ্বারা সমর্থিত হয়ে যখন মধ্যযুগে জীবনবিমুখ বৈরাগ্যধর্ম প্রধান হয়ে উঠছিল এবং জগৎ ও জীবন সম্পর্কে একটি নেতিবাদী ধারণাকে পুষ্ট করছিল তখন শংকরদেব প্রচার করেছিলেন—

গৃহতে থাকিয়া হরিক স্মরিয়া
মোক্ষ সাধা হরিনামে।

অথবা—

আরু যাইবে নালাগে নৃপতি তপোবন।
গৃহে গতি পায় করি শ্রবণ কীর্তন।।

এমন-কি 'কীর্তন ঘোষা'র 'নারদর কৃষ্ণদর্শন' অংশে নারদ কৃষ্ণকে দর্শন করতে গিয়ে বিভিন্ন স্থানে তাঁকে গৃহস্থ রূপেই আবিষ্কার করেছিলেন। এ-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "মানুষ মাত্রেই গৃহী হওয়াই স্বাভাবিক এবং না হওয়াটাই ব্যতিক্রম, ফলে একজন গৃহীর পক্ষে তাঁর ভজনীয় ঈশ্বরকে গৃহীরূপে কল্পনা করলে ঈশ্বরত্বের কোন লাঘব হয় না, বরং সাধকের পক্ষে সুবিধাই হয়,"[৪৬] সেজন্যই নাগর কৃষ্ণের পরিবর্তে শংকরদেব গৃহী কৃষ্ণকে অসমিয়া বৈষ্ণবদের ভজনীয় ঈশ্বররূপে উপস্থাপিত করেছিলেন। সংসারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ আনন্দের মধ্যে কৃষ্ণকে দর্শন করাই হল প্রকৃত ভক্তের একান্ত উদ্দেশ্য। গীতাতেও বলা হয়েছে— 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি সমহাত্মা সুদুর্লভঃ।' (গীতা -৭।১৯) সে-জন্যই শংকরদেবের বৈষ্ণবধর্মে সন্ন্যাসী বা গৃহত্যাগী নেই।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, গার্হস্থ্য ধর্মকে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে গৃহী কৃষ্ণকে ভজনীয় রূপে প্রতিষ্ঠা করে শংকরদেব ত্যাগের পরিবর্তে 'মার্জিত ভোগবাদ'-কেই কি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন? হিন্দুধর্মের সমস্ত শাখায় কিন্তু ত্যাগের মহিমা উচ্চকণ্ঠে কীর্তিত হয়েছিল। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে গোপীদের সর্বস্ব ত্যাগ ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ। এই বিতর্ক সম্পর্কে আমরা বলতে পারি, ভারতীয় জীবনদর্শনরূপ মহাসাগর মন্থন করে শংকরদেব যে-অমৃত পরিবেশন করেছিলেন সেখানেও ত্যাগের প্রসঙ্গ স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে। পরমপুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে চরম পুরুষার্থ মুক্তিবাঞ্ছা ত্যাগ থেকে শুরু করে বিষয়-বিষধরকে ত্যাগের কথাও তিনি বলেছেন; কিন্তু এক্ষেত্রে শংকরদেবের সঙ্গে অন্যান্য গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর এক ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান।

যেহেতু স্ত্রী-পুত্র-সংসার, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ইত্যাদি সমস্তই মায়ার বিভ্রম, সে-জন্যই এই সমস্ত ত্যাগ করে কৌপীনবন্ত হয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন শংকরাচার্য। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই সমস্ত মায়িক ত্যাজ্য বস্তুকে কোথায় ত্যাগ করব

আমরা? যদি "ঈশা বাস্যামিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" হয়, অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা আছে সবই যদি ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত হয় তাহলে যেখানেই আমরা ত্যাগ করি না কেন তা ঈশ্বরেই ত্যাগ হবে। সে-জন্যই বেদ থেকে শুরু করে গীতা-ভাগবতেও ঈশ্বরের উদ্দেশে ত্যাগ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শংকরাচার্য যে-ত্যাগের কথা বলেছেন তা ঈশ্বরের উদ্দেশে নয়, এখানে ত্যাগ বলতে বোঝায় মিথ্যা মায়িক বস্তুকে শূন্যের মধ্যে ত্যাগ, এই ত্যাগ জীবনে নিঃস্বতাকেই ডেকে আনে। অন্যদিকে ঈশ্বরের উদ্দেশে ত্যাগ করলে নিঃস্ব হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না, ভক্ত প্রকৃত আত্ম-ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যান্বিত হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, "পূর্ণতর রূপে লাভ করবার জন্যই আমাদের ত্যাগ।"[৪৭] এই প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য উল্লেখ করতে চাই।— "আমার শূন্যগুলিকে যেই সেই একের দক্ষিণ পরপর বসাতে থাকি অমনি তা দশ হয়, একশ হয়, সহস্র হয়, অযুত লক্ষ, নিযুত কোটি, অনন্ত হয়।...এ এক আশ্চর্য খেলা, পূর্ণকে পাবার জন্য শূন্য হওয়া, বাসি জল ফেলে ফেলে বারে বারে দেহের কলসীতে নতুন জল ভরা, আত্মাকে পাবার জন্য আত্মহারা হওয়া।"[৪৮] এই কথাই আমরা শুনেছি অন্যত্র, "... ত্যাগ তো শূন্যের মধ্যে নয়। যদ্ যদ্ কর্ম প্রকুর্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ। যা-কিছু করবে সমস্তই ব্রহ্মে সমর্পণ করবে। তোমার সংসারকে, তোমার প্রিয়জনকে, তোমার সমস্ত কিছুকেই তাঁকে নিবেদন করে দাও— এই-যে ত্যাগ এ যে পরিপূর্ণতার মধ্যে বিসর্জন।"[৪৯] অসমিয়া সমাজে ত্যাগের এই সদর্থক দিকটিকেই মধ্যযুগে তুলে ধরেছিলেন শ্রীমন্ত শংকরদেব :

পুত্র পত্নী সবাকো সেবক করি দিব।
আপুন প্রাণকো কৃষ্ণ পাওঅত অর্পিব।।

(নিমি নবসিদ্ধ-১৫১)

স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করে বানপ্রস্থ গ্রহণ নয়, জীবনের সম্যক বিন্যাসই ছিল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য।

জীব ও জগৎ সৃষ্টির মূলে বিবর্তবাদের পরিবর্তে পরিণামবাদকে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বীকৃতি দেওয়ার ফলেই শংকরদেব জগৎ সম্পর্কে এমনই এক সদর্থক জীবনবোধের জন্ম দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর আনীত জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে নৈতিকতার যে-সংযোজন তার মূলে রয়েছে পরিণামবাদ—

ক) *জীব অংশে তুমি প্রবেশিলা গায়ে গায়ে।* (কীর্তন-১৬৭৪)

খ) *হামু যত জীব শিব তেরি অংশা।* (বরগীত-৭)

গ) *তোমারে সে অংশ আমি যত জীব জাক।* (ভা. ১০।৭৩২)

দ্বিতীয়ত, নির্বিশেষ ব্রহ্মের পরিবর্তে একাধারে সবিশেষ এবং নির্বিশেষ ঈশ্বরের স্বীকৃতি পার্থিব জীবনে এক লোকোত্তর এষণার সঞ্চারে সার্থকতা অর্জন করেছিল। বস্তুত উত্তর-পূর্ব ভারতের জনজীবনে যে-সাংস্কৃতিক আবেশ তৈরি হয়েছিল তারও মূল নিহিত ছিল এখানেই। শংকরদেবের ঈশ্বর জীব-জগৎ বিবিক্ত কোনো বাক্যাতীত শূন্যতা নয়। মাধবদেব ঈশ্বর সম্পর্কে বলেছেন,

তুমি প্রভু নির্গুণ গুণর সীমা নাই।
নির্গুণ হোঅয় জীব সোহি গুণ গাই।। (বরগীত-৮৮)

নির্গুণোগুণী ঈশ্বরকে ভক্তের অধীন করে উপস্থাপিত করায় ভক্তকে যেমন বৃহতের সঙ্গে অন্বিত করা হয়েছিল, তেমনই বৃহৎ-কে দৈনন্দিন ক্ষুদ্রতার মধ্যে নামিয়ে এনে যথার্থ সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। 'পৃলুকামো হি মর্ত্যঃ'— অনন্ত কামনার দাস মানুষের অফুরন্ত কামনায় ইন্ধন না-জুগিয়ে জীবের আত্মসম্মানকে ফিরিয়ে এনেছিলেন তিনি। ধর্মীয় সোপানের শীর্ষতম স্থানাধিকারী মুক্তি-কামনাকেও অস্বীকার করে শংকরদেব বৈদিক ভারতবর্ষের ব্রহ্মভাবনার সঙ্গে অর্থাৎ বৃহতের ভাবনার সঙ্গে মধ্যযুগের যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। তাঁর বিশাল রচনায় ধ্বনিত হয়েছিল, মুক্তি নয়, সুখস্পৃহা নয়— 'নালাগে সুখভোগ নালাগে মুকতি'; চাই বৃহৎ-কে, সেই বৃহৎ-কে প্রকাশ করার অভীপ্সা, বেদের ভাষায় "বৃহৎ বদেম বিদথে সুবীরাঃ"— 'বীরোচিত মহিমায় বলব বৃহতের কথা' (ঋগ্‌বেদ ২।১।১৬)। এই বৃহতের কথাই ব্যক্ত হল শংকরদেবের রচনায় অহৈতুকী ভক্তি নিবেদনের মধ্য দিয়ে ; বিশ্বকবির ভাষায় বলা যায় যে আমরা নিতে নিতে ফকির হব না, আমরা দিতে দিতে রাজা হব। শংকরদেব মানুষকে রাজা করার যে-অভিনব প্রয়াস করেছিলেন তাতেই তান্ত্রিক অসমে এক সাংস্কৃতিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। তাই যোগিনীতন্ত্রে যেখানে ঘোষিত হয়েছিল : 'পিত্বা পিত্বা পুনর্পিত্বা যাবৎ পততি ভূতলে/উত্থায়চ পুনর্পিত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।' সেখানে শংকরদেব আপামর জনসাধারণকে বললেন ঃ 'পিয়ু পিয়ু ভাই ভাবক সকল হরিনাম রস সার'। যোগিনীতন্ত্রে যেখানে বলা হয়েছিল—

বেশ্যামধ্যগতং বীরং কদা পশ্যামি সাধকং
এবং বদতি সা কালী তস্মাদ্বেশ্যা পরো ভব।

অর্থাৎ মহাকালী বলছেন, 'বেশ্যামধ্যগত বীরদের আমি দেখতে চাই। সেজন্যই বীর সাধনে বেশ্যাপরায়ণ হও।' তান্ত্রিকরা অবশ্য এই অংশের শাস্ত্রীয় ও দার্শনিক ব্যাখ্যা করবেন। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়, "শক্তিপূজার যে-অর্থ লৌকিক বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত, সে-অর্থকে অসংগত বলা যায় না; কারণ লোকপ্রচলিত কাহিনী এবং রূপকচিহ্নে সেই অর্থই প্রবল এবং সভ্য ও বর্বর সকল দেশে সকল ভাবেই শক্তিপূজা চলছে— অন্যায় অসত্য সে-পূজায় লজ্জিত নয়, লোভ তার লক্ষ্য এবং হিংসা তার পূজোপচার।"[৫০]

এই ধর্মীয় পটভূমিতে শংকরদেব জীবকে শোনালেন, 'মন মেরি রাম চরণহি লাগু।' বললেন,

ওরে সখি পেখোরে, কঞ্জলোচন চললি নন্দকুমারা।
ইন্দু বদন, কোটি মদন, রূপে তুল নুহি যারা।। (বরগীত-২০)

অথবা—

যত জপ তীরিথ করসি গয়া কাশী;
বাসী বয়স গোয়াই।
জানি যোগ যুগুতি মতি মোহিত;
বিনে ভকতি গতি নাই।। (ওই-১৩)

নীরস শাস্ত্র-নির্দেশিত জগৎ থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতকে এক সাংগীতিক জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র দিয়েছিলেন শংকরদেব। অবশেষে সংগীতের মধ্য দিয়েই, যিনি বাক্য ও মনের অতীত তাঁকে ধরতে চেষ্টা করলেন তিনি। সংগীত সমস্ত শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা— আদি আর্ট। "সংগীত হইতেছে শূদ্র; সংগীতের স্থান সকলের নীচে, কিন্তু অধম বলিয়া নয়— সে সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে বলিয়া।"[৫১] তাই আধ্যাত্মিক সাধনপথে যত ধরনের সাধনতত্ত্ব এখন পর্যন্ত ব্যাখ্যাত হয়েছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম হচ্ছে সংগীত— 'গানাৎ পরতরং নহি'। তাই গানই হয়ে উঠেছে আর্ত মানুষের, আবার আনন্দিত মানুষেরও একমাত্র অঞ্জলি সেই জয়ী ও চির অপরাজিতের উদ্দেশে— "ত্বাম অভি প্রণোনুমো জেতারম্ অপরাজিতম্" (ঋগ্‌বেদ ১।১১। ২)। বেদের ঋষি বলেছেন, "প্রতি সূক্তানি হর্ষতম্" (ঋ-১।৯৩।১)। 'প্রতি সূক্তে অর্থাৎ সূক্তে সূক্তে তুমি আনন্দিত হও', এক গভীর প্রত্যয়ে তাঁরা বিশ্বাস করেছেন, 'আমাদের এ গান তিনি শুনতে পেয়ে আসবেনই'— "আ ঘা গমদ্ যদি শ্রবৎ" (ঋ-১।৩০।১)। শংকরদেবও বললেন, "গৃহে গতি পায় করি শ্রবণ কীর্তন।" তাঁর বরগীত ছিল পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে নিবেদিত মর্তমানুষের এক গভীরতম আকুতি। শ্রীঅরবিন্দ একেই বলেছেন, 'Fire of Human Aspiration', রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

ধায় যেন মোর সকল গভীর আশা
প্রভু, তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে।

বিষয়-বিষধরের স্পর্শে জর্জরিত মানবাত্মার আকুল প্রার্থনা শংকরদেব বাঙ্ময় করে তুলেছেন বরগীতের প্রতিটি সংগীতে। বরগীত ছিল যথার্থই 'বৃহতের গীত'— ভূমিকে অতিক্রম করে ভৌম-বাসনার স্পর্শশূন্য ভূমার সংগীত। ভক্ত ও ঈশ্বরের মধ্যে সেতু স্থাপন করার এক ভাবতরঙ্গ হচ্ছে বরগীত— তিমিরবিদারী এক ভাগবত-গঙ্গোত্রী। ঋগ্‌বেদের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয়, 'বাচো মধু' অর্থাৎ শব্দের মধু। এই বরগীতের মধ্য দিয়েই শংকরদেব বিশ্বসংস্কৃতির সুরতরঙ্গের সঙ্গে বেঁধে দিয়েছিলেন অসমিয়া ভাষাকে তথা অসম ভূমিকে।

ভূমি ও ভূমার মধ্যে এই-যে সেতুবন্ধন, যা সংস্কৃতিসম্পন্ন জীবনবোধেরও মূল উৎস, তার ভিত্তি রচিত হয়েছে পরিণামবাদেই। বিবর্তবাদের সঙ্গে সংস্কৃতির সম্পর্ক থাকতে পারে না। মূলত পরিণামবাদী বলেই শংকরদেব ভূমির সঙ্গে ভূমার, ঈশোপনিষদ-কথিত বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার[৫২] সংযোগ ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন। শংকরাচার্য যেখানে মানবদেহকে 'মাতাপিত্রোর্মলোদ্ভূতং মলমাংসময়ং বপুঃ'[৫৩] অর্থাৎ এই দেহ হচ্ছে মাতা ও পিতার মল থেকে জাত মলমাংসময় দেহ বলে একে চণ্ডালের ন্যায় অস্পৃশ্যজ্ঞানে পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেখানে শংকরদেব ঘোষণা করেছিলেন,

(ক) *কোটি কল্প অনন্তরে জীবে নরদেহ ধরে*
যদি থাকে পুণ্যর সঞ্চয়। (ভা. ১০।১৪৭৯)

(খ) *মোহোর সেবার যোগ্য মনুষ্য শরীর।* (ওই ১১।১২৯)

শুধু তা-ই নয়, সাধনপন্থার একান্ত প্রতিবন্ধক স্বরূপ জীবের বহির্মুখী ইন্দ্রিয় চেতনাকেও শংকরদেব নিরুদ্ধ করার নির্দেশ দেননি, বরং এই বহির্মুখী ইন্দ্রিয়সমূহকে ঈশ্বরের সেবায় নিযুক্ত

করে ঈশ্বরমুখীন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। বহির্মুখী ইন্দ্রিয়ের বর্ণনায় তিনি লিখেছিলেন :

নাসা গন্ধ মধুর রস রসনা, শ্রবণ, বিবিধ ধ্বনি ধায়।
নয়না রূপ, পরশ ত্বচ চাহে ভজোহো কাহে পহু পায়।।

(বরগীত-৫)

অবশেষে হৃষীকের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণের সেবার অথবা ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা ঈশ্বরের আস্বাদনের একটি অপূর্বমধুর চিত্র পরিবেশন করে ইন্দ্রিয়ের সদর্থক দিকটি তুলে ধরেছিলেন তিনি। কংসের রাজসভায় প্রবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের লোকাতীত রূপ-মাধুর্য দর্শনের বর্ণনায় ভাগবতের অনুসরণে শংকরদেব লিখেছেন :

নয়নে পিবয় যেন চেহ্লেকে জিহ্বায়।
বাহুয়ে আলিঙ্গে যেন শুঙ্গে নাসিকায়।।

(কীর্তনঘোষা-১১৮৫)

আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে শংকরদেবের এই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির প্রক্ষেপ যে-নতুন মাত্রা সংযোজন করেছিল তা সর্বভারতীয় ভক্তি-আন্দোলন প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের মূল্যায়ন থেকে লক্ষ করতে পারি : "বৈষ্ণবধর্ম, বিশেষত প্রেম ও সৌন্দর্যের এবং ভগবানের মধ্যে মানুষের সমগ্র আনন্দময় আত্মার পরিতৃপ্তি সাধনেরই ধর্ম, এমনকি ইন্দ্রিয়সুখপরতন্ত্র জীবনের বাসনা ও প্রতিরূপ সকলকেও ইহার দিব্যদৃষ্টিতে দিব্যভাবে আত্মানুভূতির মূর্তিতে পরিণত করা হইয়াছিল। জগতে এরূপ ধর্ম আর কোথায় আছে যাহা এই বিশাল উদারতা দেখাইতে পারিয়াছে অথবা যাহা আধ্যাত্মিকতা ও আনন্তে পৌঁছিবার জন্য সমগ্র প্রকৃতিকে এরূপ বৃহৎ শক্তিশালী ও বহুমুখীরূপে, এত বৃহৎ ও উচ্চভাবে নিয়োগ করিতে সমর্থ হইয়াছে?"[৫৪] সর্বভারতীয় এই পদক্ষেপের ক্ষেত্রে শংকরদেব কীভাবে পূর্বভারতকে এক সাংস্কৃতিক সম্পর্কে অন্বিত করেছিলেন তা এখানে লক্ষ করা গেল। বস্তুত শংকরদেবই প্রথমে ভারতের এই পূর্বপ্রান্তে ভারত-চেতনার জন্ম দিয়েছিলেন এবং প্রাচীন ঋষিদের 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'-র অনুসরণে 'ও ওয়া নরলোক হরি ভজিয়োক' বলে আহ্বান জানিয়ে সমগ্র বিশ্বকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শংকরদেবের অবদানের বিষয়টি প্রসঙ্গে আমরা শুধু দেখাতে চেয়েছি, এই দুই ক্ষেত্রে অসমে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি যে-বৌদ্ধিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন তাঁর মূল কোথায় নিহিত ছিল। ভারতবর্ষে সৌরসংস্কৃতির কৃষিভিত্তিক বরুণ-বিষ্ণু-কৃষ্ণের ধারায় যে-সৃষ্টিশীল মননের বিবর্তন আমরা লক্ষ করেছি তারই অন্যতম ফলশ্রুতি ছিল শক্তিজীবী ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে মধ্যযুগের ভক্তি-আন্দোলন। সামন্ততন্ত্র-পুষ্ট শূদ্রনিপীড়ক শংকরাচার্যের নেতিবাদী নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদের বিরুদ্ধেও ভক্তি-আন্দোলনের প্রবক্তারা সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। ফলে একমাত্র ঈশ্বরের উদ্দেশে আত্মনিবেদন তথা প্রেম-ভালোবাসা-উপাসনা ইত্যাদিকে স্বীকৃতি দিয়ে সেদিন ভারতের বুকে যে-মহাভারতের সূচনা হয়েছিল তার অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন শ্রীমন্ত শংকরদেব। শাস্ত্রীয় নির্দেশের বিরুদ্ধে দেশীয় ভাষার স্বীকৃতি তথা খোল-তাল সংগীত-নৃত্য সহযোগে যে-সাংস্কৃতিক বিশ্বের জন্ম দিয়েছিলেন তিনি তা আজও অসমকে ভারতীয় পটভূমিতে এক উচ্চাসনে আসীন করে রেখেছে। ❑

সংকেত-সূত্র :

১। Suniti Kumar Chatterji : The Place of Assam in the History and Civilization of India, G.U. edn. P. 52

২। K.Damodaran : Indian Thought A Critical Survey, Asia Publishing House, Kolkata, 1967, P. 315

৩। ক) "The Vaishnava school did not try to start a new philosophy, but based its teachings on Naradiya Pancharatra and the Bhagavata and laid stress on a life of purity, high morality, worship and devotion to only one God who is above all the Creator, Preserver and Destroyer."

Lakshminath Bezbaroa : The Religion of Love and Devotion, Assam Sahitya Sabha, 1968, P. 3

খ) "Vaishnavism continued to be in general a noble and sweet influence on life." Nilakanta Shastri : A History of South India, P. 433

৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবীন্দ্র-রচনাবলী, ৮ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৪৪ পৃ. ৪৪৪

৫। মীমাংসকগণ ইন্দ্র আদি দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেও তাঁদের মতে যজ্ঞের অনুষ্ঠানই ছিল প্রধান লক্ষ্য, দেবতা বা ঈশ্বর ছিলেন এখানে গৌণ— "দেবতা বা প্রয়োজয়েৎ অতিথিবৎ ভোজনস্য তদর্থত্বাৎ"— মীমাংসা-দর্শন- ৯।১।৬

৬। ক) "We see clearly that there is no basis for any conception of the unreality of the world in the hymns of the Rig-Veda. The world is not purposeless phantasm, but is just evolution of God." S. Radhakrishnan : Indian Philosophy, Vol.I, P. 103-04

খ) "There is hardly any suggestion in the Upanishads that the entire universe of changes, is a baseless fabric of fancy, a mere phenomenal show, or a world of shadows." Ibid, P. 186

গ) "The doctrine of Maya or illusion, propounded by Sankara and later emphasized in various directions. ... But this is not Indian philosophy as it can be gained from the Vedas and the Upanishads." V.K.Gokak: India and World Culture, P. 108

৭। শংকরাচার্য ঈশ্বরকেও মায়িক সৃষ্টি বলে ঘোষণা করে বলেছিলেন, "এতাবুপাধী পরজীবয়োস্তয়ো সম্যঙ্‌নিবাসে ন পরো ন জীবঃ" (বিবেকচূড়ামণি- ২৪৪) অর্থাৎ, 'মায়া হল জীব এবং ঈশ্বরের উপাধি; এই মায়া দূরীভূত হলে ঈশ্বর বা জীবের পৃথক অস্তিত্ব আর অনুভূত হয় না (একমাত্র নির্বিশেষ ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন)।'

৮। ৩।২।১১ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শংকরাচার্য লিখেছেন, "সমস্তবিশেষ রহিতং নির্বিকল্পমেব ব্রহ্ম প্রতিপত্তব্যং ন তদ্বিপরীতম্" অর্থাৎ, 'সর্বপ্রকার বিশেষত্বহীন নির্বিকল্প ব্রহ্মই একমাত্র প্রতিপাদ্য, সবিশেষ ব্রহ্ম কখনোই প্রতিপাদ্য হতে পারেন না।'

৯। ক) "... Mayavada, illusionism and otherworldliness are negative doctrines which distort the new age of India." K.M. Munshi : Bhagavat Gita and Modern Life, P. 33

খ) "In India the philosophy of world-negation has been given formulations of supreme power and value by two of the greatest of her thinkers, Buddha and Shankara." Sri Aurobindo : The Life Divine, Sri Aurobindo Birth Centenary Library, Vol.18, 1972, Pondicherry, P. 415

১০। R.D. Ranade : Indian Mysticism, Pune, 1933, P.2

১১। K. Damodaran : Indian Thought A Critical Survey, P. 315

১২। শিবনারায়ণ রায় : "জাতিবাদ মনুষ্যত্ব ও সংস্কৃতি," 'গণতন্ত্র সংস্কৃতি ও অবক্ষয়,' ১ম সং ১৯৮১, পৃ. ৯৭

১৩। Bertrand Russell : Marriage and Morals, 1st edn.1929, London, P. 21-22

১৪। Jawaharal Nehru : 'The Discovery of India', P. 85

অনুরূপ মন্তব্য অনেকেই করেছেন,

ক) "The Rigveda attached great importance to agriculture (krishi)..." Radhakumud Mukherjee : 'Hindu Civilization', Part I, P. 75

খ) "The word 'Aryan' implies one acquinted with the processes of agriculture, a rearer of the ground, to use an Elizabethan word– accustomed, therefore, to a fixed and industrialized

mode of living, evidently in contrast to others who were not." Sister Nivedita : 'The Web of Indian Life', P. 140

অবশ্য অনেকে 'ঋ' ধাতুজাত 'আর্য' শব্দটির অর্থ করেছেন 'যাযাবর'। কেননা বিভিন্ন গণে যে 'ঋ' ধাতু দেখা যায় তার অধিকাংশের অর্থই হচ্ছে গতি। ধর্মানন্দ কোসম্বী ; 'ভগবান বুদ্ধ', (বাংলা অনুবাদ শ্রী চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য) ২য় মুদ্রণ, ১৯৮৬, পৃ.৪

১৫। Gordon Childe : 'What Happend in History,' P. 274

১৬। "Indo-European languages evolving among the earliest agriculturalists." -Stuart Pigott.: 'Prehistoric India,' P. 274

১৭। অমলেশ ভট্টাচার্য : 'বেদমন্ত্র মঞ্জরী', পৃ. ১১

১৮। ড. যোগীরাজ বসু : 'বেদের পরিচয়', ১ম সং, ১৯৭৫, পৃ. ২৬১

১৯। D.H. Lawrence : 'Movements in European History', P. 54

২০। Buddha Prakash : 'Political and Social Movements in Ancient Punjab', P. 32

২১। Dr. Jyotiprasad Jain: 'Jainism : The Oldest Living Religion', P. 43

২২। S. Abid Hussain : 'The National Culture of India', P. 16

২৩। শ্রী চন্দ্রোদয় ভট্টাচার্য অনূদিত ধর্মানন্দ কোসম্বীর 'ভগবান বুদ্ধ' গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃ. ৬-৭

'ইন্দ্র' শব্দের ব্যুৎপত্তিও লক্ষ করার মতো : "'ইন্' ও 'দ্র' এই দুই শব্দের সংযোগে 'ইন্দ্র' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ইন্' মানে যোদ্ধা। উদাহরণ স্বরূপ, 'সহ ইনা বর্ততে ইতি সেনা' অর্থাৎ যোদ্ধার সহিত যে থাকে, তাহাকে সেনা বলে। ব্যাবিলনীয় ভাষায় শিখর অথবা মুখ্য অর্থে 'দ্র' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। সুতরাং ইন্দ্র মানে সেনার অধিপতি অথবা সেনাপতি। দেখিতে দেখিতে, এই শব্দটি রাজার বাচক হইয়া গেল।" *তদেব*, পৃ. ৫

২৪। ঋগ্‌বেদ ৮।৯৮।১৩-১৫

২৫। ক্ষিতিমোহন সেন : 'ভারতের সংস্কৃতি', পৃ. ৪৫

২৬। A.L.Basham : 'The Wonder That was India', P. 301

২৭। R.N. Dandekar : 'Exercise in Indology', P. 88

২৮। "The Brahmana-period does show the social and intellectual domination of the priestly class over the other classes of society." Ibid, P. 89

২৯। "The conservative Brahmins persisted in a way of life formed when cultivation was relatively unimportant to food supply." D.D. Kosambi : 'An Introduction to the Study of Indian History.' P. 170

৩০। "The Brahmins showed no interest in the higher development of the religion of the people. They were not preoccupied with ethics." Albert Schweitzer : 'Indian Thought and Its Development', P. 28

৩১। D.D. Kosambi : 'An Introduction to the Study of Indian History', P. 172

৩২। "The theological content of Brahmanical education, although admirably suited to Brahmanical purposes, had a restrictive effect on the intellectual tradition. ... The denigration of technical knowledge is an instance of the split in the educational tradition of this period, which was

to impoverish both formal and technical education. ... Astronomy had come to be regarded almost as a Sub-section ... of astrology." Romila Thapar : 'A History of India', P. 254-255

৩৩। ধর্মানন্দ কোসম্বী : 'ভগবান বুদ্ধ', পৃ. ৬২

৩৪। "The Brahmanic world-view is focussed on world and life negation, because it goes back to the magical mysticism of union with the Supra-sensuous by withdrawal from the world." Albert Schweitzer: 'Indian Thought and Its Development', P. 31

৩৫। D.D. Kosambi : 'The Culture and Civilization of Ancient India', P. 205

৩৬। D.D. Kosambi : 'An Introduction to the Study of Indian History', P. 260

৩৭। A. L. Basam : 'The Wonder That was India', P. 303

৩৮। ড. নির্মলপ্রভা বরদলৈ : সূর্য, ২য় প্রকাশ ২০০৮, গুয়াহাটি, পৃ. ১০৫

৩৯। *তদেব*, পৃ. ১০৭

৪০। গোলকেশ্বর বরুয়া; ড. নির্মলপ্রভা বরদলৈ কর্তৃক তাঁর সূর্য গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১০৭-০৮

৪১। *তদেব*, পৃ.১০৯

৪২। Lakshminath Bezbaroa : The Religion of Love and Devotion, Asom Sahitya Sabha, 1968, P. 3-4

৪৩। শংকরাচার্য সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি "...laid down the dictum that only those who were high-born could realize the non-difference of the atman and Brahman. Needless to say, the study of the Vedas and the Upanishads remained exclusively the privilege of the 'high-born' upper classes, the enlightened few under feudalism." - K. Damodaran : 'Indian Thought A Critical Survey', P. 259

৪৪। Suniti Kumar Chatterji : 'The Place of Assam in the History and Civilization of India', P. 53

৪৫। *Ibid*, P. 53

৪৬। তীর্থনাথ শর্মা : 'পঞ্চপুষ্প', পৃ. ৮০

৪৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'শান্তিনিকেতন', ১ম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ১২

৪৮। গৌরী ধর্মপাল : 'বেদ ও শ্রীঅরবিন্দ', ১ম মুদ্রণ, ১৯৮১, পৃ. ৪৬

৪৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'শান্তিনিকেতন', ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪

৫০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'রবীন্দ্র-রচনাবলী', ২৪শ খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৭৭, পৃ. ৩১৯

৫১। নলিনীকান্ত গুপ্ত : 'নলিনীকান্ত গুপ্ত রচনাবলী', ১ম খণ্ড, পৃ. ৮৬

৫২। অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতা।। (ঈশো-৯)

৫৩। 'বিবেকচূড়ামণি', পৃ. ২৮৭

৫৪। 'শ্রীঅরবিন্দ : ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি' (বাংলা অনুবাদ : সুরেন্দ্রনাথ বসু), পণ্ডিচেরি ১৯৬৯, পৃ. ২০৫

ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস

(১৮৯৪-১৯৫৫)

বিখ্যাত ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের জন্ম ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৩ চৈত্র, রবিবার। পিতা বিরজানাথ ছিলেন ক্যত্যায়ন গোত্রীয় গোঁড়া বৈদিক ব্রাহ্মণ। বর্ধিষ্ণু বনেদি বংশ। শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বানিয়াচঙের রাজবংশের সন্তান। সেখানে রামনাথের ছেলেবেলা কেটেছে বিদ্যাভূষণ পাড়ায়। প্রথমে টাইফয়েড ও পরে কলেরায় 'রামা'র শিশুজীবন ছিল বড়ই বেহাল। শৈশবে পড়াশোনা হয়নি। প্রায় আট বছর বয়সে কোনোরকমে আরম্ভ হয় লেখাপড়া। ইতিমধ্যে পিতা-মাতা উভয়েই প্রয়াত। রামনাথ মানুষ হতে থাকেন দাদা-বউদির কাছে। গোঁড়া প্রাচীনপন্থী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ মুক্তমনের মানুষ। তাই কোনো ধর্মীয় বা শুভ অনুষ্ঠানে রামনাথের প্রবেশ ছিল নিয়ন্ত্রিত। ফলে, বেপরোয়া রামনাথকে বাড়িতে ও পাড়ায় মাঝে-মধ্যেই একঘরে অবস্থায় থাকতে হত। সে-জন্যই তাঁকে অনেক সময় রাত কাটাতে হয়েছে গাছতলায় শুয়ে।

বানিয়াচং হাইস্কুলে পড়াশোনার পরে তরুণ বয়সেই বিপ্লবী সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি'-র সঙ্গে যুক্ত হন রামনাথ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে 'বেঙ্গলি পল্টন'-এর সঙ্গে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে তিনি মধ্য-প্রাচ্য ভ্রমণ করেন। মালয়েশিয়াতে কর্মরত অবস্থায় তিনি সেনাবাহিনী থেকে বিদায় নেন ১৯২৪ সালে। সাত বছর পরে, যখন তিনি প্রকৃতপক্ষে কপর্দকহীন তখন ১৯৩১ সালের ৭ জুলাই সিঙ্গাপুর থেকে সাইকেলে তাঁর বিশ্ব-পর্যটন শুরু হয়। অদম্য ভ্রমণস্পৃহায় রামনাথ চারটি মহাদেশ সফর করেন সাইকেলে চেপে এবং বেশ কয়েকবারের পর্যটনে ওইসব দেশের কারুজীবী, শ্রমিক, কৃষক সহ সাধারণ মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

যদিও রামনাথ বিদ্যালয়জীবনের পরে আর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেননি, বাংলা ভাষার উপর তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল এবং সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ তাঁকে তিরিশটিরও বেশি ভ্রমণবৃত্তান্ত রচনায় অনুপ্রাণিত করে। তাঁর রচনার মাধ্যমেই আমরা কামাল পাশার পুনর্গঠিত তুরস্কের বিষয়ে জানতে পারি এবং আধুনিক চিনের বিশাল তৎপরতার বিষয়েও তিনিই বাঙালি পাঠকদের প্রথম অবহিত করেন। অর্থবল না-থাকায় বিদেশ ভ্রমণকালে তিনি কতবার কতরকম সমস্যা ও বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন তারও চিত্তাকর্ষক বিবরণে তাঁর ভ্রমণকাহিনিগুলি সমৃদ্ধ।

ভ্রমণকাহিনি-রচয়িতা হিসাবে রামনাথের অনন্যতা যেমন প্রতিষ্ঠিত তেমনই ভূপর্যটক হিসাবেও তিনি সার্থকনামা। তাঁর লেখা বিখ্যাত বইগুলির মধ্যে 'তরুণ তুর্কী', 'মরণবিজয়ী চীন', 'লাল চীন', 'জুজুৎসু জাপান', 'ইরানের আর্য' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ❑

রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতা : প্রতিবাদের দলিল

সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়

প্রতিটি শতকের প্রতিটি দশক আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। আধুনিক কালের বিংশ শতক, বিশেষত এই শতকের চল্লিশের দশক নানা ঘটনায় পরিকীর্ণ। আত্মসমর্পণ নয়, সাময়িক পশ্চাদপসরণ নয়, সংগ্রাম-দ্বন্দ্ব-ঘৃণা-হিংসা-প্রতিহিংসা— এই মৌলিক সত্যগুলির বাইরে সাধারণ মানুষের কোনো তত্ত্ব নেই। এখানে তার উদ্‌বর্তনে হৃদয়ের অনুশাসন চরম ও পরম সত্য। আমাদের মনে রাখতে হবে যে প্রেমের জন্যই আপাতত হিংসা, মমতার বশেই আপাতত যুদ্ধ। প্রেম-প্রীতি-স্নেহ ইত্যাদি বৃত্তিগুলির পরিচর্যার জন্য প্রয়োজন কিছুটা জাগতিক সম্পদের, কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্যের, পরিপূর্ণ মানসিক সুস্থতার। যতদিন এই সম্পদ, এই সাচ্ছল্য কতিপয় মুষ্টিমেয়ের করায়ত্ত, ততদিন বেশিরভাগ লোক প্রেমের বাইরে পড়ে থাকবে। তাদের জন্য ছিনিয়ে আনতে হবে ভালো থাকার আকর। অতএব প্রতিরোধ, অতএব শ্রেণি-সংগ্রাম।

উত্তাল চল্লিশে ভারতের রাজনৈতিক বাতাবরণ বহু তরঙ্গ-আবর্তে সংক্ষুব্ধ। তার একদিকে রয়েছে ফ্যাসিস্ট-বিরোধিতা, জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে কমিউনিস্ট ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মতভেদ, বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ, ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক সমস্যা, সুভাষচন্দ্রের দেশনায়কত্ব, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, ভারতের তথাকথিত স্বাধীনতা লাভ, তে-ভাগা আন্দোলন। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের (৭.৫.১৮৬১-৭.৮.১৯৪১) জীবনাবসান, সুকান্ত ভট্টাচার্যের (১৫.৮.১৯২৬-১৩.৫.১৯৪৭) অকালমৃত্যু ও গান্ধীজির (২.১০.১৮৬৯-৩০.১.১৯৪৮) অপমৃত্যু তো রয়েছেই। দুর্ভাগ্য আমাদের এখানেই পিছু ছাড়েনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১.৯.১৯৩৯-২.৯.১৯৪৫) মারণযজ্ঞে আমরাও উদ্‌ভ্রান্ত। বলা বাহুল্য, চল্লিশের এইসব ঘটনা কবিতার শব্দলাঞ্ছনেও প্রমিত।

বাংলা কবিতার চল্লিশের দশক ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ তেরো-চোদ্দ বছর ধরেই বিস্তৃত। কারণ সাহিত্যের ঐতিহাসিক ধারায় কোনো কিছুই ছিন্নমূল নয়। তিরিশের দশকের মাঝামাঝি থেকেই বাংলার জনমানসের একটা অংশে পরিবর্তনের অভিঘাত শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত নাগরিক চিন্তাভাবনার একেবারে মূলকেই স্পর্শ করেছিল। তার ভাবনার জগৎ ছিল অন্তরলোক থেকে বিশ্বলোক। সাম্রাজ্যবাদ ও স্বৈরতন্ত্রের প্রতিরোধের চেতনায় অভিষিক্তি কবিগণ চল্লিশের কবিতায় নতুন সুর আনলেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যেই কয়েকজন নতুন কবির প্রতিষ্ঠা ঘটে গেল। অরুণ মিত্র, বিমলচন্দ্র ঘোষ, চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, দিনেশ দাস, মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন— এঁরাই প্রথম কবিতায় নতুন বার্তা শোনালেন। ১৯৩৬-এ 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘ'-এর প্রতিষ্ঠা; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সে-বছরই স্পেনের গৃহযুদ্ধ, স্পেনের গণতন্ত্রী সরকারের পক্ষে বিশ্ব-জনমত গড়ে ওঠা— এ-সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ-ছাড়াও রয়েছে বাংলায় 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ'-এর প্রতিষ্ঠা (১৯৪২),

'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ'-এর প্রতিষ্ঠা (১৯৪৪) এবং স্বাধীন ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ (২৬ মার্চ ১৯৪৮) হওয়া। এই অশান্ত আবর্তের মধ্যে দেখা দিলেন আরও কয়েকজন কবি— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, মৃগাঙ্ক রায়, জগন্নাথ চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গোলাম কুদ্দুস, অসীম রায়, চিত্ত ঘোষ, কৃষ্ণ ধর প্রমুখ। এঁদের সকলের লেখা নিয়েই চল্লিশের কবিতা। চল্লিশের দশকের কবিতা সম্পর্কিত আলোচনায় জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথকেও উদার দৃষ্টিতে গ্রহণ করতে হবে। এই চল্লিশের দশকের কবিদের চিরায়ত প্রেমের, নিসর্গমুগ্ধতার, আত্মমগ্নতার কবিতার কথা ভুলে থাকা যাবে না। তাই চল্লিশের কবির নিবন্ধনে অশোকবিজয় রাহা, অরুণকুমার সরকার, নরেশ গুহ, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ মিত্র, রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী, বাণী রায়, রাজলক্ষ্মী দেবীর নাম আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আমরা অবশ্যই মনে রাখব সমকালীন বাংলা কবিতা-পত্রিকাগুলির কথাও। এই সময়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিশিষ্ট কবিতা-পত্রিকাগুলি হল 'কবিতা' (ত্রৈমাসিক, সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু, ১৯৩৫), 'জীবাণু' (মাসিক, সম্পাদক সুশীল রায়, ১৯৩৬), 'নিরুক্ত' (ত্রৈমাসিক, সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য, ১৯৪০), 'একক' (ত্রৈমাসিক, সম্পাদক শুদ্ধসত্ত্ব বসু, ১৯৪১) ও 'অঙ্গীকার' (দ্বিমাসিক, সম্পাদক শচীন ভট্টাচার্য ও পূর্ণেন্দু পত্রী, ১৯৪৯)।

চল্লিশের কবিতার বহিরঙ্গ রূপে ছিল গদ্য-প্রবণতা। এ-বিষয়ে মণীন্দ্র রায় লিখেছেন, "আমাদের কালে একটা বড় চেষ্টা ছিল, কবিতাকে গদ্যের কাছাকাছি আনা এবং তা সত্ত্বেও কবিতার প্রাণধর্মকে টিকিয়ে রাখা। চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে যাঁরা কবিতার ক্ষেত্রে এসেছেন তাঁদেরও অনেকের চেষ্টা এদিকে অব্যাহত ছিল।" ('আমার কালের কবি ও কবিতা', প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুআরি ১৯৮১, প্রকাশক : কথামালা, ১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, পৃষ্ঠা ৬৪) সময়-সংঘাতের নিরন্তর চাপে চল্লিশের অনেক কবিই অনুভব করেছিলেন যে এই দুস্থ মর্মান্তিক সময়ক্রমকে চিত্রায়িত করার ক্ষেত্রে কবিতায় লিরিকের লালিত্য, অলংকারের শিঞ্জন, ছন্দের অনুরণন বেমানান হবে। তাই চল্লিশের অনেক কবিই নিটোল গদ্যবহুল পঙ্‌ক্তিবিন্যাসের মধ্যে আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন। আসল কথা, বিপন্ন স্বদেশের তমসাচ্ছন্নতা, জীবনযাপনের ক্ষতবিক্ষত অভিজ্ঞতাকে প্রজ্ঞাপিত করতে গিয়ে চল্লিশের কবিতা গদ্যগন্ধী প্রবণতাই দাবি করেছিল। সময়ের দাবিকে মনে রেখেই চল্লিশের কবিরা গদ্য-বাহুল্যের মধ্যে ভাবের মুক্তি খুঁজেছিলেন। যেমন সমর সেনের (১০.১০.১৯১৬-২৩.৮.১৯৮৭) মধ্যবিত্ত জীবনভাবনায় উঠে এসেছে—

তোমার ক্লান্ত উরুতে একদিন এসেছিলো
কামনার বিশাল ইশারা।
ট্যাঁকেতে টাকা নেই,
রঙিন গণিকার দিন হ'লো শেষ,...
কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম,
স্ফীতোদর দাম্ভিক স্বামীর পিছনে গর্ভবতী সতী সাবিত্রী,
আর বন্যার মতো পুত্রকন্যা, অরণ্যে রোদন;
হে ঈশ্বর, এ কী অপরূপ!

('ঘরে বাইরে')

অথবা গদ্যভঙ্গিতে রাম বসুর (১৯২৫-২০০৭) গভীর উচ্চারণ—

আমাদের পেটে তো ভাত নেই
পরনে কাপড় নেই
খোকার মুখে দুধ তো নেই এক ফোঁটাও—
তবু কেন এই গঞ্জ হাসিতে উছলে ওঠে
তবু কেন এই স্টীমার শস্যেতে ভরে ওঠে
আমাদের অভাবের নদীর ওপর
কেন ওরা সব পাঁজরকে গুঁড়িয়ে যায়?

তাই চরম সিদ্ধান্ত— 'আমাদের সড়কিতে কেউটে আঁধার ফর্সা হয়ে যাক।' তারপর দৃপ্তকণ্ঠে নির্দেশ—

এসো
বাইরে এসো—
আমরা হেরে যাব না
আমরা মরে যাব না
আমরা ভেসে যাব না
নিঃস্বতার সমুদ্রে একটা দ্বীপের মতো আমাদের বিদ্রোহ
আমাদের বিদ্রোহ মৃত্যুর বিভীষিকার বিরুদ্ধে—
এসো বাইরে এসো
আমার হাত ধরো
পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে।

('পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে', কাব্যগ্রন্থ : তোমাকে, ১৯৫০)

দিনটি ছিল ২৭ এপ্রিল ১৯৪৯। স্বাধীনোত্তর ভারত। মানুষের মতো বাঁচার দাবি নিয়ে বন্দি ভাই ও ছেলের মুক্তির জন্য বউবাজার স্ট্রিটে (অধুনা বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিট) তে-ভাগা সমিতির ডাকে শোভাযাত্রায় বেরিয়ে এসেছিলেন হাওড়া, হুগলি, ২৪ পরগনার সুদূর পল্লিগ্রাম থেকে মহিলারা, কলকাতার বস্তিবাসী আর মধ্যবিত্ত নারীরাও এসেছিলেন। সেদিন 'ভারত সভা হলে' শ-আড়াই নারী জড়ো হয়েছিলেন আর অনিলা দেবী (১৯১৩-২০০৩) সেই সভায় বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। সভার শেষে মহিলারা ১৪৪ ধারা ভেঙে পথে নেমেছিলেন। এই শোভাযাত্রার ওপর পুলিশের গুলি চলেছিল। এতে চারজন মহিলা ও তিনজন পুরুষ প্রাণ হারান। নিহত মহিলাদের মধ্যে ছিলেন লতিকা, প্রতিভা, অমিয়া ও গীতা। ট্রাম, বাস থেমে গেছে— দোকানপাট বন্ধ। মিছিল ছত্রভঙ্গ। গলির মোড়ে মোড়ে স্তব্ধ মানুষের ভিড়। কিছু ছাত্র, কিশোর ও মহিলার দঙ্গল বয়ে নিয়ে চলেছে একটি প্রাণহীন দেহ সকলের স্তব্ধ দৃষ্টির সামনে দিয়ে। একটি অজ্ঞাতনামা পুরুষের নিথর দেহ। এই নামহারা মৃতের উদ্দেশে রাম বসু নিবেদন করলেন—

ও যেখানে পড়ে আছে রক্তপদ্ম ফুটেছে সেখানে।

জনহীন রাজপথ সংজ্ঞাহীন ট্রামের লাইন
এ পাশে নিষ্প্রাণ বাড়ি জড়সড় অন্ধকার মুখে
কয়েকটা পুলিসট্রাক, হেলমেট, রাইফেল, জীপ,
একটা শেলের শব্দ, মাটি ফেটে ধোঁয়ার নাগিনী
পাক খেয়ে উঠে পড়ে, শূন্যে দোলে চক্রময় ফণা।

রক্তাক্ত সে শুয়ে আছে পৃথিবীর সান্ত্বনার কোলে।

ওখানে রয়েছে শুয়ে গুলি-বিদ্ধ একটা মানুষ
বুকে তার রক্তপদ্ম মুখে তার চৈত্রের পলাশ
অঙ্গজুড়ে শান্ত নদী যন্ত্রণার গোলাপ বাগানে
তাকে ঘিরে গাছ পাখি বসন্তের প্রকৃতি আকাশ।

একটা হত্যার রক্তে ভেসে গেল শহরের মুখ
চমকে নিভল আলো, তারপর ঘন অন্ধকারে
তার খোলা চোখে এল আস্তে আস্তে ভোরের আকাশ
সেই চোখে চোখ রাখে এত সাধ্য ছিল না খুনীর।

ও যেখানে শুয়ে আছে সেখানেই জয়ের সম্মান
সেখানেই সূর্য ওঠে, সেখানেই জেগে থাকে ধান।

('একটি হত্যা', কাব্যগ্রন্থ : যখন যন্ত্রণা, ১৯৫৪)

এই ঘটনায় কমিউনিস্ট লেখক ও কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের (১৭.৬.১৯২০-১৯.৪.২০০৩) কলমে অশ্রু-রক্ত-আগুনে ঝলসে উঠল—

শান্তি নেই সেদিন থেকেই
কী করে ভুলব আমি, কী করে ভুলব
সেদিন লতিকা সেন কলকাতার প্রকাশ্য রাস্তায়
বন্দী স্বামীপুত্রদের মুক্তি দাবি করে
বুলেটে জবাব পেল;
দেখেছি কেমন করে দৃপ্ত কণ্ঠ ডুবে গেল ভলকে ভলকে রক্ত
রক্তের উচ্ছ্বাসে;
দেখেছি কেমন করে পাগলা কুত্তা হেলমেট মাথায়
লাঠি-গুলি-গ্যাসে দাঁতে নখে
রক্তবমনে উদ্‌গারে
বিষ্ঠায় নোংরায়
জীবনটা ক্লেদাক্ত করল।
শান্তি নেই সেদিন থেকেই। শুধু তারপর
অনেকদিন মাঝরাত্রে তন্দ্রা ছুটে স্তম্ভিত শুনেছি
দুধের বাচ্চার কান্না— যেন একলা অন্ধকার ঘরে
ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে কোনো এক মাতৃহীন শিশু—
মা তার হারিয়ে গ্যাছে তারাভরা কান্নার আকাশে।

('শান্তি নেই', কাব্যগ্রন্থ : মেঘবৃষ্টিঝড়, ১৯৫১)

১৯৪৬ সালে ব্রেথওয়েট কারখানার শ্রমিকদের ওপর গুলি চালনা ও কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগের প্রতিবাদে খিদিরপুরে হাজার হাজার শ্রমিক ধর্মঘটে শামিল হয়। তাদের মধ্যে রয়েছে মেটাল বক্স, ব্রুক বন্ড, জে স্টোন ও অর্ডন্যান্স কারখানার শ্রমিক। শ্রমিক-আন্দোলনের এই নতুন তরঙ্গ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের (১২.২.১৯১৯-৮.৭.২০০৩) কবিতার প্রেরণার উৎসভূমি। তিনি লিখলেন—

রক্তের ধার রক্তে শুধবো কসম ভাই!
ব্রেথওয়েটের গোয়ালিয়রের জবাব চাই।
লাখো লাখো হাত, এক হলে বলো
পরোয়া কাকে?

শিকলে বেঁধেছো; হাত দিলে শেষে
মুখের গ্রাসে!
শয়তান, চাও ভাঙতে কলিজা
গুলিতে গ্যাসে?

পার পাবে নাকো। দেওয়ালে ঘোষণা :
শেষ লড়াই—
বারুদে লাগালে আগুন যখন,
পুড়ে হও ছাই।।

দিকে দিকে আজ দুঃশাসনের ভিৎ পড়ো-পড়ো
যুগসন্ধির মোড়ে মোড়ে ভুখা-নাঙ্গারা জড়ো।
শানানো কাস্তে, হাতুড়ির মুখে
সোজা জিজ্ঞাসা;
দু'শো বছরের রক্ত শুষেও
মেটেনি পিপাসা?
বজ্রনিনাদে ঘরে ঘরে আজ পৌঁছোয় ডাক;
যেখানে যে আছে, ময়দানে সব এক হয়ে যাক।
কড়া-পড়া হাতে শিকল ভাঙার
শপথ কঠিন—
আমাদের হবে কলকারখানা, জায়গা জমিন।
রক্তের ধার রক্তে শুধবো কসম ভাই।
ব্রেথওয়েটের, গোয়ালিয়রের জবাব চাই।
লাখো লাখো হাত এক হলে বলো পরোয়া কাকে?
আমাদের দাবি কে রোখে? কে রোখে লাল ঝাণ্ডাকে?
('জবাব চাই', ১৭.১.১৯৪৬)

সাম্যবাদী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনেক আগেই আত্মজবোধে আমাদের ডাক দিয়েছেন—

কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?
কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে।
লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা—
দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে,
কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?
('সকলের গান', কাব্যগ্রন্থ : পদাতিক, ১৯৩৮-৪০)

"আমি আমার জীবনে একটি সত্যকেই সব সত্যের চেয়ে বড়ো বলে মনে করি। সে হল শিল্প, সাহিত্য ও সমাজের ক্ষেত্রে আমরা যা কিছু করি না কেন, সব কিছুই মানুষের জন্য, মানুষকে মহত্তর জীবনে উন্নীত করার জন্য। সেই সঙ্গে নিজের আত্মিক তৃপ্তির জন্যও বটে। দেশের দুর্গত মানুষের সম্পর্কে বলবার মতো আমার কিছু কথা ছিল, ছিল কিছু জ্বলন্ত প্রতিবাদ; অবিচার, অত্যাচার, শাসন, শোষণের বিরুদ্ধে। যে ভাষায় বলেছি, যে আঙ্গিকে বলেছি তাকে যদি কেউ কাব্য বলতে না চান তাতে ক্ষতি কি?" ('এষা', ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩৭৪ আশ্বিন, সম্পাদকীয় নিবন্ধ)— কথাগুলি বলেছেন আত্মপ্রত্যয়নিষ্ঠ কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ (১২.১২.১৯১০-২২.১০.১৯৮১)। তিনি দৃপ্তকণ্ঠে সর্বহারার পক্ষ নিয়ে বলতে পারেন—

থুতু দিয়ে চিঁড়ে-ভিজানো মালিক-মজুরের নয়া-প্রেমের কুটিল
ভেদ পন্থার বড়াই,
আমরা মানি না, মানি শুধু মহাপৃথিবীর পথে সঙ্ঘবদ্ধ
রাঙা আগুনের শিখায় দীপ্ত ন্যায্য দাবীর লড়াই।
('৭ নভেম্বর', কাব্যগ্রন্থ : ফতোয়া, ৭ নভেম্বর ১৯৪৭)

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের আত্মময় সাধনা—

মানববুদ্ধির প্রথম উন্মেষ লগ্ন থেকে
আমি মুক্তি চেয়েছি :
প্রতিটি মানুষের
প্রতিটি শস্যকণার
প্রতিটি মঞ্জরী-মুকুল-পুষ্পের,
মুক্তি চেয়েছি
নৃত্যের সঙ্গীতের কাব্যের
মহান উদার জড়জাগতিক চিন্তাশীলতার।
('বিপ্লব', কাব্যগ্রন্থ : উদাত্ত ভারত, ১.৫.১৯৫৪)

বিমলচন্দ্র ঘোষের অগ্রজ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (৩০.১০.১৯০১-২৫.৬.১৯৬০) ছিলেন বহুভাষাবিদ্ পণ্ডিত ও মনস্বী, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী বুদ্ধির অধিকারী, তথ্যে ও তত্ত্বে আসক্ত, দর্শনে ও সংলগ্ন শাস্ত্রসমূহে বিদ্বান; তাঁর পঠনের পরিধি ছিল বিশাল এবং বোধের ক্ষিপ্রতা ছিল অসামান্য। বৈদান্তিক পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্তের (১৬.১.১৮৬৮-১৬.৯.১৯৪২) পুত্র সুধীন্দ্রনাথ মর্মে-মর্মে রোমান্টিক কবি এবং একজন শ্রেষ্ঠ রোমান্টিকও। তাঁর চেতনায় লীন হয়ে আছে সমকালীন পৃথিবীর ইতিহাসতত্ত্ব—

তুমি বলেছিলে জয় হবে, জয় হবে;
নাট্‌সী পিশাচও অবিনশ্বর নয়।
জার্মানি আজ ম্রিয়মাণ পরাভবে;
পশ্চিমে নাকি আগত অরুণোদয়।
অন্তত রুষ বাহিনী বন্যাবেগে
কবলিত করে শোষিত দেশের মাটি;
বিভীষণদের উচ্ছেদে ওঠে জেগে
স্বাধীন প্যারিস্, যথারীতি পরিপাটী;

এ-বারে সমরে, শান্তিতে সহযোগী
মার্কিন্ ঢালে সমানে শোণিত টাকা;
ধনিক যুগের প্রধান ভুক্তভোগী
ইংলণ্ডেই সমাজতন্ত্র পাকা।।

২

অবশ্য চীনে নেতারা স্বার্থপর,
সর্বথা জনশক্তির বাধ সাধে;
স্থগিত ভারতে আপ্ত কালান্তর,
জিন্না যেহেতু বিমুখ গান্ধিবাদে।
তাছাড়া আবার রক্ষকে ভক্ষকে
ভেদ ভোলে স্বচ্ছন্দ বেলজিয়ামে;
ইটালীর প্রতিবিপ্লবী পক্ষকে
সম্মুখে রেখে ত্রাতারা তারণে নামে।
তথাচ গ্রীসের ট্রট্স্কীয় বামাচারী
বিনষ্ট চার্চিলের বাক্যবাণে;
ধরে তুরস্ক বিশ্রুত তরবারি;
আর্জেন্টিনা প্রগতির রথ টানে।।

('১৯৪৫', কাব্যগ্রন্থ : সংবর্ত, ১০ এপ্রিল ১৯৪৫)

বিষ্ণু দে-র (১৮.৭.১৯০৯-৩.১২.১৯৮২) 'সন্দ্বীপের চর' কাব্যগ্রন্থের (প্রথম প্রকাশ ১৯৪৭) শেষ কবিতা হল '১৫ই আগস্ট'। তিনি অসংশয় দৃষ্টিতে বরণ করেন '১৫ই আগস্ট'-কে—

মুক্ত বর্ষভোগ্য শাপ, মুক্ত হল কলকাতার বেড়ী

চণ্ডীমণ্ডপের পাঠে, পঞ্চায়েতী বটে
গৃহস্থ সন্ধ্যায় কিংবা মুদীর চালায় শোনা যায় সেইরাবণের
স্বর্ণলঙ্কাপুরে ছিল বন্দী সীতা মাটির দুহিতা
চারপাশে ঘিরে রাখে রাক্ষসের সৈন্য কিংবা চেড়ী
শ্রাবণের সন্ধ্যা থেকে রটে পথে পথে শ্রাবণের
কলকাতার মুক্তির বন্যায় সন্দেহ শঙ্কার
মৃত্যুর মারীচদের তড়িৎ ত্বরিত শেষ, নিঃশেষ অসুর

... ...

শ্রাবণের ধারাজলে বৃষ্টি যেন মড়কের দুর্ভিক্ষের দেশে
লোক চলে, হাতে হাত, নিশানে নিশান,
গানে গান, কোলাকুলি, সেলামে হাসিতে
ট্রামে বাসে ট্রাকে ট্রাকে সৌজন্য অশেষ
হে আশ্চর্য শহর আমার এ আমার মৃত্যুঞ্জয় দেশ!
বন্যা নয় প্রাণেরই বিন্যাস
বিরাট দায়িত্ব নেয় স্বতই জনতা
শত শত নেতা আসে
গান্ধীজীর প্রতিভাসে

সেদিন কমিউনিস্ট পার্টির মতে ১৫ আগস্টের আজাদি ছিল ঝুটা। তাই বিষ্ণু দে-র 'শান্তি, মৈত্রী, প্রেমের উচ্ছ্বাস' নিয়ে কমিউনিস্ট-শিবিরে উপহাস-পরিহাসের অন্ত ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকাময় নিষ্প্রদীপ অন্ধকারে বাংলার বুকে নেমে এসেছিল পঞ্চাশের মন্বন্তর। লক্ষ লক্ষ নরনারীর সমাকীর্ণ শবের মহাশ্মশানে বসে এক কবি পাঁচটি কবিতায় যে-পঞ্চপ্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন— 'অন্নদাতা', 'অন্ন দাও', '১৩৫০', 'দূরের ভাই' আর 'নিমন্ত্রণ'— সেই কবিতা-পঞ্চকের আলো কাব্যলোকে আজও অনির্বাণ জ্বলছে।

বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে নিরন্ন নরনারী যখন মহানগরীর বুকে শেষ-শয্যা রচনার জন্য ছুটে আসছে তখন এই এক কবি অমিয় চক্রবর্তী (১০.৪.১৯০১-১২.৬.১৯৮৬) বলছেন—

পাথরে মোড়ানো হৃদয় নগর
জন্মে না কিছু অন্ন—
এখানে তোমরা আসবে কিসের জন্য?
বেচাকেনা আর লাভের খাতায়
এখানে জমানো রক্তপণ্য—
যারা দান দেয় তারা মুনাফায়
সাধুতার সুদ ক'ষে তবে হয় দাতা,
নয়তো তারাও রাষ্ট্রচাকায় পিষ্ট, দরদী নাগর।
তাদের দেওয়ায় ফলবে না ধান শান-বাঁধা কলকাতা।।

সেই মহাদুর্দিনে কবিকণ্ঠে হঠাৎ বজ্র-নির্ঘোষ ধ্বনিত হয়েছিল—

আসো যদি তবে শাবল হাতুড়ি
আনো ভাঙবার যন্ত্র,
নতুন চাষের মন্ত্র।

একদিকে এই 'নতুন চাষের মন্ত্র', অন্যদিকে 'অন্নহারা বাংলা দেশে' যখন 'সোনার ধান নিরুদ্দেশ' তখন বিদেশাগত যুদ্ধের সৈনিককে সম্বোধন করে কবি বলছেন—

কার স্বদেশে এসেছো জেনো দূরের ভাই।
ভারতমাটির ধুলো

নীলাম্বরের আকাশতলে অরণ্যে
মনে-মনেই কপালে তুলো।
অচেনা মাঠ, নদীর ঘাট, লক্ষগ্রাম, সংসারে
এখানে প্রাণ পেয়েছে পুজো,
তাকেই খুঁজো,
দেশকে পাবে আপন লোকের বুকে।

কিন্তু এই কবিতা-পঞ্চকের মধ্যমণি হল '১৩৫০' শীর্ষক কবিতাটি। ভাষা ও ছন্দে কবিতাটি অশ্রুসিক্ত শিল্পের অনবদ্য নিদর্শন—

হাত থেকে তার প'ড়ে যায় খ'সে
অবশ আধলা ধুলোয়।
চোখ ঠেকে খোলা অসাড় শূন্যে
প্রাণ, তুমি আজো আছো ঐ দেহে,
আছো মুমূর্ষু দেশে।
কঙ্কাল গাছ ভাদ্রশেষের ভিখারী ডালটা নাড়ে
কড়া রোদ্দুর প্রখর দুপুরে ফাটে।

কঙ্কালদেহিনী মৃত্যুপথযাত্রিণী বাংলার মেয়ের মর্মস্পর্শী রূপকল্প রচনায় কবির বাণীশিল্প অনবদ্য— 'কঙ্কাল গাছ ভাদ্রশেষের ভিখারী ডালটা নাড়ে'।

মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সেই অন্ধকার দিনগুলিতে কবির বেদনা ভাষা পেয়েছে 'সন্দ্বীপ', 'সাংবাদিক', 'আহুতি', 'সনেট', 'সত্যাগ্রহ' প্রভৃতি কবিতায়। সমাজ-বিবেকের সঙ্গে শিল্পকর্মের যে কোনো অসংগতি নেই, এই কবিতাগুলিতে তা প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের স্মরণে রাখা দরকার, ১৯৪৮ সাল থেকে কবি অমিয় চক্রবর্তী মার্কিন দেশে প্রবাসী। কিন্তু 'পারাপার' কাব্যগ্রন্থের (প্রথম প্রকাশ ১৯৫৩) অনেক কবিতা স্বদেশের মাটিতে বসে বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে রচিত। তাই 'পারাপার'-কে কবি চার ভাগে বিন্যস্ত করেছেন— 'ছড়ানো মার্কিনি', 'ভারতী', 'য়ুরোপা' এবং 'দুই তীর'। 'পারাপার' কাব্যগ্রন্থের 'ভারতী' পর্যায়ের কবিতাগুলিতে অনুভূতির সজল ছায়া বেদনায় ঘনীভূত।

রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (৮.২.১৯২৫-২১.১১.১৯৪৫) 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ ছাত্রসমাজ আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মুক্তির দাবিতে কলকাতায় যে-শোভাযাত্রা বার করে তাতে অংশগ্রহণকালে রামেশ্বর পুলিশের গুলিতে মারা যান। তাঁর এই মর্মান্তিক মৃত্যুকে স্মরণীয় করতে প্রতি ২১ নভেম্বর ছাত্রদল শোকসভায় মিলিত হয়। ১৯৪৭ সালে ২১ নভেম্বর জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ ও তে-ভাগা আইন পাশের দাবিতে বিরাট কৃষক মিছিলের সঙ্গে 'রামেশ্বর দিবস' উলপক্ষে ছাত্র মিছিলও ছিল। ২১ নভেম্বর ১৯৪৭ তারিখের ছাত্র-কৃষক মিছিলকে ব্রিটিশ আমলের কায়দায় 'স্বাধীন' বাংলার সরকার মোকাবিলা করলেন। যুদ্ধোত্তর কলকাতার প্রথম শহিদ রামেশ্বরের স্মৃতি নতুন বাংলার ছাত্রসমাজের কাছে এক পবিত্র উত্তরাধিকার। তারই অনুরণন সাংবাদিক-সাহিত্যিক অসীম রায়ের (৭.৩.১৯২৭-৩.৪.১৯৮৬) রক্তঝরা কলমে—

হাজার শ্রাবণ জল ঢেলে যাক ঘাসের চাপড়া ঘিরে
পথের ধুলোয়, সে দাগ তবুও মুছবে না মুছবে না,
যে যৌবনের শিক্ষা হয়েছে রক্তের স্বাক্ষরে
ঘুম পাড়ানিয়া গান গেয়ে তাকে ভুলাতেও পারবে না
নতুন শপথ এসেছে আবার; অস্ফুট কলস্বরে
হাতের মুঠিতে এখনো যখন আগামীর আনাগোনা
মিলেছি আবার হয়েছি জমাট একুশে নভেম্বরে।

('২১ নভেম্বর', ২৩.১১.১৯৪৭)

আবার অতীতকে ফিরে দেখা। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল— এই সাতটি বছর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীভৎস বিভীষিকা পৃথিবীকে পৈশাচিক নরকে রূপান্তরিত করল। তারই বর্ণনায় কবি অজিত দত্ত (২৩.৯.১৯০৭-৩০.১২.১৯৭৯) বলছেন—

আতঙ্কে সুড়ঙ্গ-পথে ভীত বীর খোঁজে রসাতল,
মহামান্য মহাজন প্রাণভয়ে করে হাহাকার,
পাপের নিয়তি আসে, অব্যর্থ সে গৃধিনী-কবল,
জীবন্তের শব-ভুক্, কৃষ্ণ অভিশাপ বিধাতার।

কবি প্রলয়-লগ্নকে বলেছেন 'মাহেন্দ্র-মুহূর্ত'। তাঁর কথায়—

মাহেন্দ্র-মুহূর্ত এই ভয়ংকর মৃত্যুর স্তুতির।
হে তান্ত্রিক, শুরু করো তোমার নিষ্ঠুর বামাচার
না হতে রক্তের স্রোতে খোঁজা শুরু স্বর্ণশস্যকণা
আবার সংগ্রাম হবে স্বর্ণলঙ্কা আর জীর্ণ চীর,
পুনরায় আকাশেরে বিঁধে দেবে লক্ষ হাতিয়ার
ভীষ্মের মতন, যদি ব্যর্থ হয় তোমার সাধনা।

('বোধন', কাব্যগ্রন্থ : নষ্টচাঁদ, ১৯৪৫)

প্রলয়ের অন্ধকারে এই অশিববিনাশী 'বোধন' মন্ত্রোচ্চারণে অজিত দত্তের কবিমানসের নতুন দিক উদ্‌ঘাটিত হল। ধিক্কারে

ভর্ৎসনায়-ব্যঙ্গভাষণে এ-যেন আর-এক কবি। তিনি বলেন—

ভুখ-মিছিলে চোখের আলোর কোনোই মূল্য নাস্তি—
এই কথাটাই সবার বড়ো শাস্তি।

('শাস্তি', কাব্যগ্রন্থ : প্রাগুক্ত)

কিন্তু অন্ধকার যতই মসিকৃষ্ণ হোক, তার থেকেও 'উত্তরণ' আছে। ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরে পৌঁছে সারা পৃথিবীর সঙ্গে কবিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন—

অধমর্ণ বালির প্রতাপ
ঋণলব্ধ শক্তির নেশায়
যে-পথে হেনেছে অভিশাপ
সে-পথ পশ্চাতে লুপ্তপ্রায়।

কেননা মৃত্যুর রক্তসমুদ্র পেরিয়েই মানুষ মৃত্যুঞ্জয় মহিমায় উত্তীর্ণ হয়।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৫.৮.১৯২৬-১৩.৫.১৯৪৭) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে (১৯৪১-৪২) মার্ক্সবাদী চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তিনি ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে উৎসর্গিত হয়েছিলেন। ১৯৪২ সালের গোড়ার দিক থেকে তাঁর রাজনৈতিক কর্ম শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে দুই কবির উক্তি স্মরণীয়। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন, "সুকান্ত বড় কবি হলেও বয়স তার একুশ পেরোয়নি। তার বেশীর ভাগ লেখাই আরও কম বয়সের।" (ভূমিকা, 'সুকান্ত সমগ্র', প্রকাশক : সারস্বত লাইব্রেরী) অন্য কবি তরুণ সান্যালের (জন্ম : ২৯ অক্টোবর ১৯৩২) কথায়, "...সুকান্ত সচেতন শ্রমিক শ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের সমুদ্রসন্ধানী রূপ।" ('কেন সুকান্ত', সুকান্ত স্মৃতি, সুজিতকুমার নাগ সম্পাদিত সংকলনগ্রন্থ, প্রথম প্রকাশ : ৩০ শ্রাবণ ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ১০০) এইসব কথা আত্তীকরণ করে বলা চলে, ইতিহাসের অমোঘ অস্ত্রশালায় সুকান্ত-দধীচি অস্থিমালার বজ্রে মানুষ বরাভয়ের মন্ত্র শুনবে। তিনি মহামানবের 'বোধন' কামনা করে বলেছেন—

হে মহামানব, একবার এসো ফিরে
শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরের ভিড়ে,
এখানে মৃত্যু হানা দেয় বারবার;
লোকচক্ষুর আড়ালে এখানে জমেছে অন্ধকার।
এই যে আকাশ, দিগন্ত, মাঠ স্বপ্নে সবুজ মাটি
নীরবে মৃত্যু গেড়েছে এখানে ঘাঁটি;
কোথাও নেইকো পার
মারী ও মড়ক, মন্বন্তর, ঘন ঘন বন্যার
আঘাতে আঘাতে ছিন্নভিন্ন ভাঙা নৌকার পাল,
এখানে চরম দুঃখ কেটেছে সর্বনাশের খাল,
ভাঙা ঘর, ফাঁকা ভিটেতে জমেছে নির্জনতার কালো,
হে মহামানব, এখানে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো।

এই সর্বনাশের জন্য দায়ী কারা? অন্যায় যারা করছে তারাই শুধু নয়, নীরবে যারা এই অন্যায় সহ্য করে যাচ্ছে তারাও দায়ী—

ব্যাহত জীবনযাত্রা, চুপি চুপি কান্না বও বুকে,
হে নীড়-বিহারী সঙ্গী। আজ শুধু মনে মনে ধুঁকে
ভেবেছ সংসারসিন্ধু কোনোমতে হয়ে যাবে পার
পায়ে পায়ে বাধা ঠেলে। তবু আজো বিস্ময় আমার—
ধূর্ত, প্রবঞ্চক যারা কেড়েছে মুখের গ্রাস
তাদের করেছ ক্ষমা, ডেকেছ নিজের সর্বনাশ।

কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (জন্ম : ১৯ অক্টোবর ১৯২৪) কবি সুকান্তের কথার অনুরণন তুলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন—

যে মাঠে সোনা ফলানো যায়, আগাছা জমে ওঠে
সেখানে, এরা জানে না কেউ— কী রঙে ঝিলিমিল
জীবন,— তাই বাঁচে না কেউ; দুয়ারে এঁটে খিল
নিজেকে দূরে সরায়, দিন গড়ায়। সেই সোনা
ঝরে না, ভেঙে পড়ে না ঢেউ— দুয়ারে মাথা কোটে,
এখানে মন বড় কৃপণ— এখানে থাকব না।

('ঢেউ', নীলনির্জন কাব্যগ্রন্থ, প্রথম প্রকাশ, শ্রাবণ ১৩৬১)

সিদ্ধেশ্বর সেনের (২৬.৩.১৯২৬-২১.৪.২০০৮) স্বদেশ জিজ্ঞাসায় নন্দিত জীবনের অনশ্বর ব্যস্ততার প্রতি দায়বোধ ছিল। এই দায়বোধই তাঁর কবিতার নিরন্তর চলমানতার ধাত্রী। তাই তাঁর ৪৫-এর আবেগ সম্পূর্ণ টানটান থাকতে পারে ৫১-তেও যখন তিনি উচ্চারণ করেন—

হে স্বদেশ
অপমান হত এ দেশ
হে ভয়ংকর দেশ
হে ভয়াল ভ্রূকুটির দেশ
হে শ্মশান-মশানচারী দেশ
হে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের দেশ
আমার ভালোবাসার দেশ
অশ্বত্থের ছায়ায় নদীর কিনারে

ডাহুকের দেশ
মেঘলা আকাশের দেশ
টইটুম্বুর সরোবরের দেশ
সাত রাজার ধন এক মাণিকের দেশ
মা-জননীর কোল ঘেঁষে যশোদা-দুলালের দেশ
('জননী জন্মভূমিশ্চ')

চল্লিশ-পঞ্চাশ ব্যাপী উপদ্রুত বাংলা, ভারতবর্ষ তথা গোটা দুনিয়ার লাঞ্ছিত মানবতার পাশে দাঁড়িয়ে কবি মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে তার কাছেও কৈফিয়ত তলব করেন—

আমি কৈফিয়ৎ তলব করি,
মৃত্যুদূত:
কোথায় হৃতবাক্ শিশু
কি কিশোরের জ্যোতির্ময় চোখ থেকে
জিজ্ঞাসা উপড়ে ফেলে
সাপের মতো জিভ বার করে জিভ উগরেছ?
কতো না সীমন্তিনীর সাধে বারুদ লাগিয়ে
জিঘাংসায়, উল্লাসে চলে পড়েছ?
কতো জোয়ান সমর্থ দেহ বুলেট কুরে
বন্দুকের কুঁদোয় থেঁতলিয়ে
শকুনের মুখে ছুঁড়ে দিয়েছ?
কোথায় কোন গর্ভবতীর পবিত্র সম্মান
জানোয়ারের উত্তেজনায় ছিঁড়ে খুঁড়ে
রিরংসার নরক জাগিয়েছ?
('আমার মা-কে ২')

মায়ের ভাঙা বুকের আর্তনাদ, কোলের মরা মেয়েটির জন্য জীবনভিক্ষা— এই দিয়ে যে-কবিতার শুরু, সেই মেয়েটির আঙিনায় নেমে আসায়, মায়ের শান্তি ও স্নেহে তার আপাত বিরতি। এই মা কোথাও চলে যান না, সিদ্ধেশ্বর সেনের কবিতায় তিনি কোথাও 'ধাত্রী' কোথাও 'জননীজন্মভূমিশ্চ' আবার শহরের ফুটপাতে তিনিই 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'। মা ও সন্তানের এই বিনিময় চলতে থাকে।

'মধুবংশীর গলি' আর জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র (১৮.১১.১৯১১-২৬.১০.১৯৭৭) যেন অচ্ছেদ্য বন্ধনে সংলিপ্ত। ৩১৫ পঙ্‌ক্তির এই সুদীর্ঘ কবিতাটি ১৯৪৩ সালের শেষের দিকে রচিত হলেও প্রথম কবিতা-সংকলন হিসেবে 'মধুবংশীর গলি'-র আত্মপ্রকাশ চুয়াল্লিশের শেষ পর্বে। তবে সেই অস্থির সময়ে শুধু কলকাতা নয়, শহর ছাড়িয়ে গ্রাম বাংলার হাটে-মাঠে, রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে কবিতাটি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কবি মণীন্দ্র রায় লিখেছেন— ""মধুবংশীর গলি', সকলেই জানেন সমাজমনস্ক কবিতা এবং আকারে সুদীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও এককালে মাসের পর মাস বছরের পর বছর কলকাতা এবং অখণ্ড বাংলার অজস্র শহরে, এবং বাংলার বাইরেও নানা জায়গায় এ কবিতার আবৃত্তি শোনা গেছে। সেটা ছিল বিদেশী শাসনের নৃশংসতম অধ্যায়, যখন জাপানী আক্রমণের আশঙ্কায় কলকাতায় চলছে নিষ্প্রদীপ আর নারীমাংসলোভী বিদেশী সৈন্যের আনাগোনা, এবং তারই সঙ্গে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ মারার সেই ষড়যন্ত্রমূলক দুর্ভিক্ষ। অন্যদিকে জাতীয় আন্দোলনেরও তখন তুঙ্গ অবস্থা, আর তারই সঙ্গে মিশে রয়েছে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলন, প্রগতি সাহিত্য আর নবনাট্য আন্দোলন। এরই বিক্ষুব্ধ, আলোড়িত এবং বেদনার্ত প্রতিফলন ধরা পড়েছে 'মধুবংশীর গলি' নামক কবিতার দর্পণে।" (ভূমিকা, কবি জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, রাজধানী ও মধুবংশীর গলি : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, সারস্বত লাইব্রেরী, ফাল্গুন ১৩৯৯) দিনযাপনের গ্লানিময় কর্মের অবসানে ২৫ নম্বর মধুবংশীর গলিকে সম্বোধন করে এ-কবিতার কবি বর্ণনা করছেন—

হে পঁচিশ নম্বর
মধুবংশীর গলি,
তোমাকেই আমি বলি।
রৌদ্রস্নাত খাটুনির পর সমস্ত দিন
মেরুদণ্ডহীন
মানুষগুলিকে সম্মান করে,
নগ্ন নগণ্য সন্ধ্যাকে পাই
— তোড়াবাঁধা শ্মশানে পাঠাবার ফুল—

বর্ণনার শেষ উপমাটির প্রসঙ্গ যেমন আমাদের মনকে পীড়িত করে, তেমনই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন এ-দেশে আগত মিত্রশক্তির সৈনিকদের ঝরে-পড়া 'সামরিক আশিস' তির্যক ব্যঙ্গে ঝলসে ওঠে আশ্চর্য বাক্-প্রতিমায়—

চলে রণদগ্ধ জীবনের ছায়ার মিছিল,
ক্ষুধার হুঙ্কারে ডোবে উন্মার্গের গান।
বাঁকা টুপিপরা কোনো আমেরিকান
কাপ্তেনের লোলুপ শিস
তরুণী রাত্রির গালে চাবুক মারে।

পরিশেষে ইতিহাসের অমোঘ শিক্ষা প্রাণিত করে কবির শিল্পীপ্রাণকে, 'প্রাণকল্লোলে ঐ নবযুগ আসে'—

স্বপ্ন জেগে উঠেছে, উঠেছে
স্টালিনগ্রাদে, মস্কোভায়, টিউনিসিয়ায়,
মহাচীনে।
মহা আশ্বাসের প্রবল নিঃশ্বাসে
দুর্দমনীয় ঝড় উঠেছে সৃষ্টির ঈশান কোণে।
গভীর আত্মপ্রত্যয়ে দীপ্ত হয়ে তাই ঘোষণা করে :
স্তব্ধডানা পৃথিবীর নীড়ে আসবে নেমে
সুস্থ কামনার স্বর্ণচিল,
... ...
তারপর সুস্থ মুক্ত অনর্গল প্রাণসঙ্গিনীদের নিয়ে
আবিশ্ব প্রাণ-নৃত্যের আসরে
জমবে ভাল, জমবে তখন
মধুবংশীর গলি,
বজ্রনিনাদে তোমাকেও ডেকে বলি।।

প্রেমেন্দ্র মিত্র (৪.৯.১৯০৪-৩.৫.১৯৮৮) সমকালীন জীবনের বিশ্বস্ত কবি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর পেরিয়ে ভ্রাতৃঘাতী আত্মদ্রোহ, অবশেষে রাষ্ট্রনৈতিক শৃঙ্খল মোচনের পর স্বাধীন ভারতের আশা ও নৈরাশ্য, সংশয় ও সংকট, কল্পিত আদর্শ ও তার বাস্তবীভবন— সমস্ত কিছুই কবির মানসদর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকাময় প্রেক্ষাপটে বাংলার বুকে পঞ্চাশের মন্বন্তর নেমে এল। পঞ্চাশ লক্ষ লোক অনশনে প্রাণ দিয়ে যুদ্ধের দক্ষিণা চুকিয়ে গেল। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখলেন 'ফ্যান'। নগরের পথে পথে 'ঠিক মানুষের মতো কিংবা ঠিক নয়, যেন তার ব্যঙ্গচিত্র বিদ্রূপ বিকৃত', 'অদ্ভুত এক জীব', 'উচ্ছিষ্টের আস্তাকুঁড়ে বসে বসে ধোঁকে আর ফ্যান চায়।' এই অবস্থায় শাসকশ্রেণির পক্ষ থেকে ত্রাণের যে-ব্যবস্থা করা হয় তা প্রকৃত পরিত্রাণের উপায় নয়, কবির ভাষায় 'তা পৈশাচিক নিষ্ঠুর কল্যাণ'। কারণ শাসক শ্রেণির সাময়িক ব্যবস্থাপনায় দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণ দূর হয় না, আসলে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ যাতে শাসকশ্রেণির মুখের অন্ন কেড়ে না-নেয় সে-জন্য শাসকশ্রেণি 'অন্ন ছেঁকে তুলে নিয়ে' 'ক্ষুধাশীর্ণ মুখে ফ্যান ঢেলে দেয়'। এ-এক নিষ্ঠুর প্রতারণা। কারণ ফ্যান অন্নের বিকল্প নয়, অন্নের বর্জ্য পদার্থ। এর বদলে কবি চান— এইসব প্রবঞ্চক নিষ্ঠুর শাসক শ্রেণির বিরুদ্ধে ক্ষুধাতুর মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে উঠুক। দধীচির হাড়ের চেয়েও কঠিন 'রাজপথে কচি-কচি এই সব শিশুর কঙ্কাল'-এ লড়াই হোক তীব্রতর।

'ফেরারী ফৌজ' কাব্যের (প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৮) আর-একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হল 'তিনটি গুলি'। খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরের বছর মহাত্মা গাঁধী আততায়ীর গুলিতে নিহত হলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখলেন—

তিনটি গুলির পর
স্তব্ধ এক কণ্ঠরুদ্ধ রাত
ভুলে গেল চন্দ্রসূর্য
ভুলে গেল কোথায় প্রভাত।

আততায়ীর তিনটি গুলিকে কবি বলেছেন—

প্রথম গুলির নাম
অন্ধ মূঢ় ভয়।
দ্বিতীয়টি আমাদের
নিরালোক মনের সংশয়।
বিবর-বিলাসী হিংসা
তৃতীয় গুলির পরিচয়।

আশাবাদী কবির কাছে হন্তারকের গুলির শব্দ 'হয়ে ওঠে পরিশুদ্ধ/মৃত্যুজিৎ বাণী বরাভয়।/মারণ অস্ত্রের নাদ পরম লজ্জায়/শান্তির অমৃত-যন্ত্রে পায় শেষে নয়।'

কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসুর (১.৩.১৯২১-৩০.৫.২০০০) 'প্রতিজ্ঞা'-র কথাও (কাব্যগ্রন্থ : কয়েকটি সনেট, প্রকাশকাল ১৯৪২) আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি—

আমার মৃত্যুকে আমি বিনামূল্যে পারি না হারাতে
ধিক্কারে বাঁচার চেয়ে মরণকে আমি ভাবি বড়,
প্রতিক্ষণে প্রতিদণ্ডে কাঁদে মন এ দু'শো বছর—
স্বর্ণাঙ্গ ভারত আজ কালো সাজে সবার পশ্চাতে
পর পদানত হয়ে বৈদেশিক বণিকের হাতে
ডুবেছে ঐতিহ্য, ঋদ্ধি, — এর মাটি হলো অনুর্বর।
স্বাধীন হৃদয়বত্তা চূর্ণ করে নকল অন্তর
কৌশলে-চাতুর্যে-শাঠ্যে ভারতের মর্মে মর্মে গাঁথে।
ভারতের কালো সাজ মুছে দেব মৃত্যু বিনিময়ে
এই দুশো বছরের দাসত্বের প্রায়শ্চিত্ত খুঁজে

রক্তে স্বেদে উর্বরতা বুনে দেব লালিত্যে সবুজে,
দস্যুহীন হিন্দুস্থান উদ্ভাসিত নব সূর্যোদয়ে।
আমার রক্তের ছোপে ঘুণ ধরা ভারতীয় ধান
আবার নতুন করে পূর্বেকার পাবে খাদ্যপ্রাণ!

"১৯৪১। হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণ। কলকাতার ডক-অঞ্চলে প্রথম জাপানী বোমা নিক্ষিপ্ত হ'ল। সারা পৃথিবী তখন ফ্যাসিস্টদের ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। আমাদের দেশের শতকরা নব্বইজন তো হিটলারকে ভগবানের অবতার বলেই মেনে নিলেন। ঢাকা-রমনায় ব'সে কবি মোহিতলাল মজুমদার পর্যন্তও এই মতের প্রতিধ্বনি করলেন। কবি-মনীষী দত্তেরও মনে সংশয় : "It is difficult to choose between Communism and Fascism." সেই স্থির বিশ্বাসের কবিতা "কাস্তে"। এতে বলতে চেয়েছিলুম— জার্মান-ফ্যাসিস্টদের বেয়নেট যত তীক্ষ্ণই হোক না কেন, কাস্তে-হাতুড়ি অর্থাৎ জনগণের সঙ্গে তারা পাঞ্জা লড়তে পারবে না। তাই ঘটল।"— কথাগুলি লিখেছিলেন দিনেশ দাস (১৬.৯.১৯১৩-১৩.৩.১৯৮৫) 'কাস্তে' কাব্যগ্রন্থের (প্রথম প্রকাশ : ৯ মে ১৯৭৫) ভূমিকায়। 'কাস্তে' কবিতার ইতিহাসও তিনি লিখেছেন— "১৯৩৭ সালে রচিত হল "কাস্তে"। কিন্তু হাতুড়ি বর্জিত করা সত্ত্বেও রাজরোষের ভয়ে কোনও সম্পাদক কবিতাটি প্রকাশ করতে চাইলেন না। ফলে, কবিতা লেখা ছেড়ে দিলাম। কারণ কবির প্রকাশ কবিতা। এই প্রকাশের মধ্যেই তার ব্যক্তিত্ব। তা যদি খণ্ডিত হয় তাহ'লে কবিতা রচনা ক'রে কী লাভ। অবশেষে এক বছর পরে কবি অরুণ মিত্রের সৌজন্যে 'কাস্তে' কবিতাটি প্রকাশিত হয় শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় (১৯৩৮)। কবিতাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানী-গুণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অগ্রজ কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে ওই কবিতাটির ছত্র "এ যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে" উদ্ধৃতি দিয়ে বুদ্ধদেব বসুর ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকায় দু'টি সার্থক কবিতা লিখলেন। তখনই কবি মহলে সাড়া পড়ে যায়। অগ্রজ কবিদ্বয়ের অনুসরণে এই ছত্রটিকে শিরোনাম ক'রে কবি কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত প্রমুখ সেকালের তরুণ কবিরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতা রচনা করেন। "এ যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে" নামে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি ছোটগল্পও "অলকা" মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়। সেইজন্য 'কাস্তে' কবিতাটি শুধু আমার জীবন নয়, 'বাংলা সাহিত্যে একটি ঘটনা'।" (প্রাগুক্ত)

একটি কবিতাকে নিয়ে কাব্যমহলে যে আলোচনার অন্ত ছিল না তা প্রমাণ করতেই এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি উদ্ধার করা হল। দিনেশ দাসের এই প্রতিস্পর্ধার কারণ তিনি বলেছেন— "ভয় আমাকে ভীষণভাবে ভয় করে।" 'বামপন্থী', 'ডাস্টবিন', 'হাতুড়ি', 'বাংলা : ১৩৫০', 'ভুখ মিছিল', 'যুদ্ধবাজদের ভোজ' প্রভৃতি কবিতা তাঁর স্বদেশচিন্তার রূঢ় বাস্তব রূপ। তাঁর কাছে গণদেবতার দুঃখ-দুর্দশা আপন লজ্জা আর গ্লানি ছাড়া কিছুই নয়। চারদিকে হাহাকার, মৃত আর মুমূর্ষের ভিড়ে প্রাণের কঙ্কালটুকু নিয়ে কবি আদিম শরীরটিকে প্রতিকারহীন কষ্টসাধনে চালিত রেখেছেন। কবির এ-এক নিষ্প্রাণ জীবন নিয়ে শুধু দিন যাপনের গ্লানি—

আমার দু'পায়ে ঠেকে শত মৃতদেহ
তবু তো বহেছি প্রাণ নিঃসন্দেহ,
এদের অনেকে একদিন ঝরায়ে অনেক স্বেদজল
মাঠে মাঠে পুঁতে গেছে সোনার ফসল
তাদের মুখের অন্ন মুখে তুলি আজকে যখন
মনে করি প্রাণপণ
আমার কি প্রাণ আছে? যদি বেঁচে থাকি আমি
এর চেয়ে নেই লজ্জা, নেই বড় গ্লানি।

চল্লিশের দশকে ক্ষতবিক্ষত সময় ও অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (২.৯.১৯২০-১১.৭.১৯৮৫) কাব্যচর্চার শুরু। চল্লিশের দুস্থ ও মর্মান্তিক সময়ক্রম থেকে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেননি। স্বাধীনতা তখনও অনাগত, মন্বন্তর তার থাবা নিয়ে ভয়ংকর উত্তেজনা-উদ্‌বেল এই সময়কেই প্রজ্ঞাপিত করেছিল তাঁর কবিতায়—

ভীষণ সব সর্বনাশগুলি
দেখতে হয়নি তোমাকে চোখ মেলে;
জ্বলতে হয়নি ছেচল্লিশের যন্ত্রণায়, মার এবং মহামারির
ভীষণ রোগ রক্তে নিয়ে
দেশ যখন সন্তানের হিংসা, দ্বেষ, মায়ের দেহের মাংস নিয়ে
কাড়াকাড়ি নরক।
দেখতে হয়নি সাতচল্লিশের লুম্বিনীর চেয়ে ইতর
ভারত জুড়ে দেশভাগের উত্তেজনা।

('মৃত্যুর পর, কুড়ি বছর')

স্বাধীনতা-উত্তরকালে মন্বন্তরের করালগ্রাসে বাংলার গ্রামজীবন যখন বিপর্যস্ত, শহরের পথে পথে নিরন্ন মৃত্যুমিছিল তখন সময়-সংঘাতের চাপে, যুগযন্ত্রণার নির্মম নিষ্পেষণে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় চল্লিশের নিরন্ন সমাজচিত্রই বিষয়ীভূত

হয়েছিল—

শহরের এখন সন্ধ্যা নেমেছে, তৃষিতের কথকতা...
ফ্যান দাও বলে কারা কাঁদে রাস্তায়
ঘরে নেই ভাত, মাগো, তুই কাছে আয়—
আমি পড়ি বসে কুপির আলোয় জীবনের রূপকথা।

('লাল শপথের রাখি')

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মাটির কবি, মাটির কাছাকাছি মানুষের কবি। তাঁর কবিতায় বারবার ধরা পড়েছে মানুষ ও মাটির সম্পর্ক। এর সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার বেদনায় তিনি লেখেন—

ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যদি আমি মাটিকে জানতাম।

মাটি ও মানুষের থেকে বিচ্ছিন্ন মিথ্যা কবিতার চটক-জালিয়াতি তাঁর কাছে অসহ্য মনে হত। তাই তাঁর কবিতায় বারবার ফিরে এসেছে মাটি ও মানুষের প্রতি মমত্ব—

একবার মানুষের দিকে
... ...
তুমি মাটির দিকে তাকাও, মাটি প্রতীক্ষা করছে,
তুমি মানুষের হাত ধরো, সে কিছু বলতে চায়।

কবি মণীন্দ্র রায় (৪.১০.১৯১৯-২৮.৮.২০০০) 'পঞ্চাশের প্রেত' কবিতায় (কাব্যগ্রন্থ : সেতুবন্ধের গান, প্রথম প্রকাশ : জানুআরি ১৯৪৮) সমকালীন কঠিন সত্যকে চিত্রিত করেছেন—

শুধু কি দেখেছ ধ্বংস পেটে-হাত পথের যাত্রায়?
হাড়ের হাপরে শুধু ওঠাপড়া মৃত্যু দেখ তুমি?
ফাটা মাঠে কালসূর্য আকালের দিগন্ত নাচায়?
দেখ না হরিৎ স্বপ্নে গুরু-গুরু আশার মৌসুমী।

কবরের অন্ধকার জানি আজো দুর্ভিক্ষের দেশে।
অমৃতদুর্লভ জানি পিলেভরা পেটের কুইনীন।
অনেক এরণ্ড-নেতা বেপরোয়া স্বার্থের নির্দেশে
গৃহস্থে সজাগ আর চোরে চুরি মন্ত্রণা প্রবীণ!

তাঁর বোধ-বুদ্ধি-হৃদয় ছিল মানবকেন্দ্রিক। অন্যায়ের সঙ্গে আপস নয় বরং অপ্রিয় সত্যচিত্রকে প্রকাশ করাই তাঁর কবিধর্ম—

আবেগ এখন কাঁপায় এ-মন তুরঙ্গ নয়—
ভাঙা ঝরঝরে ট্যাক্সির মতো, গতির চাপে
অপটু শরীরে বিক্ষোভ যেন। ভীরুপ্রণয়
উধাও। নিটোল বিজ্ঞ ও বাঁকা হাসির মাপে
মেপেছি হৃদয়— শাদা জল দিতে যে ভদ্রতায়
গয়লারা দুধ মাপে, ফাউ দেয়; চুপচাপ দেখি
যে অক্ষমতার বুকে চেপে; আর যে তুচ্ছতায়
চার আনা দামের একটাকা হারে একশ মেকি
টাকার বেতনে ভদ্রতা ঢাকি; সেই আবরণ
কালো পর্দায় ঢেকেছে সদর অন্দর। তাই
প্রেমের চাহনি আনে না পাওয়ার জাদু শিহরণ।
ভিড়ের যাত্রী, চোখে-চোখ রাখা কথাকে ডরাই—
চমকাই— যেন আয়নায়-ছোঁড়া রৌদ্রঝিলিক
ছিঁড়ে দেয় ভিড়ে চলার গড্ডলিকার দড়ি।
ছত্রভঙ্গ স্বাধীনতা তাই লাগে যে অলীক।

('প্রস্তাব', প্রাগুক্ত ক

চল্লিশের যে-সব কবি স্বদেশ ও মানুষের সঙ্গে সংলগ্ন থাকার তাগিদে এই সমাজতান্ত্রিকতায় আত্মমগ্ন ছিলেন তাঁদের মধ্যে আরও দুই উল্লেখযোগ্য কবি হলেন অরুণ মিত্র (২.১১.১৯০৯-২২.৮.২০০০) ও কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত (২.২.১৯১৮-১.৫.১৯৯৮)। অরুণ মিত্র 'লাল ইস্তাহার' কবিতায় লিখছেন—

এখন প্রহর গোনা।
উপোসী হাতের হাতুড়িরা উদ্যত,
কড়াপড়া কাঁধে ভবিষ্যতের ভার;
দেবতার ক্রোধ কুৎসিত রীতিমতো;
মানুষেরা হুঁশিয়ার!
লাল অক্ষরে লট্‌কানো আছে দ্যাখো
নতুন ইস্তাহার।

অন্যদিকে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত 'বেলাশেষের গান' কবিতায় লিপিবদ্ধ করছেন—

সংগ্রাম শুরু, হুঁশিয়ার থাকো ভাই
প্রাচীরে প্রাচীরে দ্যাখোনি ইস্তাহার?
এ সমাজ ভাঙা নতুন সমাজ চাই
নয়া দুনিয়ার আমরা কর্ণধার।

গোলাম কুদ্দুসের (২০.১.১৯২০-১৪.১২.২০০৬) প্রথম কবিতার বই 'বিদীর্ণ' ১৯৫১ সালে প্রকাশ পেলেও কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন অনেক অনেক দিন আগে। তাঁর ফ্যাসিবাদ-বিরোধী কবিতা 'করিম বক্স' আজও স্মরণীয়। করিম নামে এক

সাধারণ মজুরের বসন্ত রোগাক্রান্ত অবস্থায় লড়াইয়ে সরাসরি শারীরিকভাবে যোগ দিতে না-পারার আক্ষেপে কবিতাটি শেষ হয়েছে। কবিতাটির শেষ চারটি পঙ্‌ক্তি হল—

করিম বক্‌সের পক্‌সে যেন জগৎ গেছে জুড়ে,
যখন রক্ত জাগল তখন, অঙ্গ গেছে পুড়ে।
ইংরেজী প্যাকস, জার্মানী প্যাকস। নানান প্যাকসের চাপে
প্যাকসে পক্‌সে মিতালীটা চলে সমান দাপে।

'বিদীর্ণ' কাব্য-সংকলনের আবহে আছে দেশভাগের বিদীর্ণতা, 'জীবনগ্রন্থ' নামের দীর্ঘ কবিতায় কবি দেখিয়েছেন, গ্রন্থকীট স্বপ্নিল এক যুবমানস কীভাবে পারিপার্শ্বিক চাপে পরিবর্তিত হচ্ছে। একদিন বইয়ে বাধ্য মন ইতিহাস ও সাহিত্যের বিদ্যা ও আলস্যে গড়ের মাঠ, উদ্ধত যুবতী দেখে কাটাত। এখন দেশভাগ, দুর্ভিক্ষ, কন্ট্রোল, নিষ্পাপ শিশুর ওপর আল্লার গজব, রাজনৈতিক নেতত্বের মধ্যে ভাগাড়ের মড়া নিয়ে কাড়াকাড়ি দেখে সে অস্থির। 'দুরন্ত দুর্বার নড়ে/বুঝি ফেটে পড়ে/হৃৎপিণ্ড দেশজননীর।' বস্তাপচা কেতাবের মদ সরিয়ে রেখে মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে ধরে চালের কাতারে ফুটপাতের ওপর কারখানার দ্বারে 'নতুন জীবনকে খুঁজি'।

তে-ভাগা আন্দোলনের পক্ষে (সেপ্টেম্বর ১৯৪৬) অনেক কবিই কলম ধরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় (কবিতা : 'শান্তি নেই'), রাম বসু (কবিতা : 'গজেন মালী') ও পঞ্চাশের কবি মণিভূষণ ভট্টাচার্য। মণিভূষণ 'তেভাগা' কবিতায় লিখছেন—

ভুলে যেতে চাই, পারিনে তা
ভোলা কি সহজ ফসলের
ক্ষীর দুধ রক্তমাখা মুখ,
এসেছিলো সারাতে অসুখ।
... ...
মাঠের আগুনে পোড়ে মাঠ,
মাঝখানে দশানন ভ্রাতা
ঘরভেদী বানিয়েছে বেদী
চৌর্যযুগে সেজেছে সম্রাট।

কবি ও সম্পাদক জহর সেনগুপ্ত 'তেভাগার শহীদ স্মরণে' কবিতায় কৈফিয়ত চেয়েছেন—

মৃত্যু নিয়ে কোন কথা নেই
শুধু জেনে নিয়ে হয়
মৃতের হাড়ের মুনাফা পাবে কে?

কত কথা আছে, কত প্রাণ আছে বিংশ শতকের চল্লিশের দশককে ঘিরে। শুধু কবিতায় নয়, ছোটদের ছড়ায়ও এই দশকের স্বার্থমগ্ন মানুষের কথা রূপ ও বাণী লাভ করেছে। অন্নদাশঙ্কর রায় 'রাঙাধানের খই' কাব্যগ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ : ১৯৫০) 'খুকু ও খোকা' (প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৭) কবিতায় সহজ ভাষায় মর্মস্পর্শী প্রশ্ন রেখেছেন—

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো।
তার বেলা?

আমরা প্রদেশ, জেলা, জমিজমা, ঘরবাড়ি, পাটের আড়ত, ধানের গোলা, কারখানা, রেলগাড়ি, চায়ের বাগান, কয়লাখনি সবই ভেঙে ফেলেছি। আমরা দুর্ভাগ্যবশত ভারত ভাঙতে গিয়ে নিজের বাংলাদেশটাও ভেঙে ফেলেছি। অথচ সামান্য ক্ষতিতে আমাদের উন্মাদনার অন্ত নেই। তাই কবির আবার জিজ্ঞাসা—

তেলের শিশি ভাঙল বলে
খুকুর পরে রাগ করো
তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা
বাঙলা ভেঙে ভাগ করো!
তার বেলা?

এ-ভুলের কোনো ক্ষমা নেই। এখন স্বদেশ-স্বজন হারানোর ক্ষতকে প্রশমিত করতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাণীকেই আত্মস্থ করতে হবে। তিনি 'পারাপার' কবিতায় লিখছেন—

আমরা যেন বাংলাদেশের
চোখের দুটি তারা
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে—
থাকুক গে পাহারা।
দুয়ারে খিল।
টান দিয়ে তাই
খুলে দিলাম জান্‌লা।
ওপারে যে বাংলাদেশ
এপারেও সেই বাংলা।।

(কাব্যগ্রন্থ : ফুল ফুটুক, প্রকাশকাল ১৯৫১-১৯৫৭)

এ-কথা না-মেনে উপায় কী! এ আমাদের নিজ পাপকৃত

কলঙ্ক। কবি জীবনানন্দ দাশ (১৮.২.১৮৯৯-২২.১০.১৯৫৪) সে-কথাই আমাদের শুনিয়েছেন—

এ-যুগে কোথাও কোনো আলো— কোনো কান্তিময় আলো
চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের; নেই তো নিঃসৃত অন্ধকার
রাত্রির মায়ের মতো; মানুষের বিহ্বল দেহের
সব দোষ প্রক্ষালিত ক'রে দেয়— মানুষের বিহ্বল আত্মাকে
লোকসমাগমহীন একান্তের অন্ধকারে অন্তঃশীল ক'রে
তাকে আর শুধায় না— অতীতের শুধানো প্রশ্নের
উত্তর চায় না আর— শুধু শব্দহীন মৃত্যুহীন
অন্ধকারে ঘিরে রাখে, সব অপরাধ ক্লান্তি ভয় ভুল পাপ
বীতকাম হয় যাতে— এ-জীবন ধীরে ধীরে বীতশোক হয়,
স্নিগ্ধতা হৃদয়ে জাগে; যেন দিকচিহ্নময় সমুদ্রের পারে
কয়েকটি দেবদারুগাছের ভিতরে অবলীন
বাতাসের প্রিয় কণ্ঠ কাছে আসে— মানুষের রক্তাক্ত আত্মায়
সে-হাওয়া অনবচ্ছিন্ন সুগমের— মানুষের জীবন নির্মল।
আজ এই পৃথিবীতে এমন মহানুভব ব্যাপ্ত অন্ধকার
নেই আর? সুবাতাস গভীরতা পবিত্রতা নেই?
তবুও মানুষ অন্ধ দুর্দশার থেকে স্নিগ্ধ আঁধারের দিকে
অন্ধকার হ'তে তার নবীন নগরীগ্রাম উৎসবের পানে
যে অনবনমনে চলেছে আজো— তার হৃদয়ের
ভুলের পাপের উৎস অতিক্রম ক'রে চেতনার
বলয়ের নিজ গুণ র'য়ে গেছে ব'লে মনে হয়।

(কবিতা : ১৯৪৬-৪৭, কাব্যগ্রন্থ : বেলা অবেলা কালবেলা)

এ-কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে মানবের অন্তর্নিহিত স্বরূপ— তার সেই নিত্যসত্তা দুরবগাহ ও অনন্ত রহস্যময়। কবির কথায়—

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর।

(কবি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাব্যগ্রন্থ : শেষ লেখা, সংখ্যা ১৩, ২৭ জুলাই ১৯৪১)

কিন্তু এখানেই চল্লিশের দশকের কবিতার রূপ ও স্বরূপের ইতিকথার ইতি নয়। সমকালীন সংকটজনিত মানবের ক্ষোভ, দুঃখ, প্রতিবাদ, অনন্ত জিজ্ঞাসা ও আত্মানুসন্ধানের এ-এক কড়ি-কোমলে আধারিত কাব্যশিল্পে বিন্যস্ত প্রতিবেদন। কিন্তু এই সমকালেই আরও কত কবির সহজাত প্রেম, প্রকৃতি, অনন্ত ভালোবাসার ছান্দসিক বাণীও ছিল। এবার তারই সন্তর্পিত অনুসন্ধান।

সামাজিক দায়বদ্ধতার গরজ, সময়ের সোদরপ্রতিমতা, উদ্‌বেল সময়ের উপযোগী কণ্ঠস্বরকে দূরে সরিয়ে রেখে চল্লিশের দশকে আর-একটি স্বতন্ত্র ধারার কবিতা উৎসারিত হয়েছিল। নিরুদ্‌বিগ্ন জীবনের প্রতি ঝোঁক, মায়ামমতার মেদুরতায় আচ্ছন্ন, নিপুণ ছন্দের লিরিক বিন্যাস— এইসব উপজীব্য করে একদল কবি সাজিয়ে তুলেছিলেন তাঁদের কবিতার জগৎ। রাজনৈতিক বিশ্বাসজাত কবিতার বৈচিত্র্যহীনতা, সময়ের কাছে সমর্পিত প্রবণতার একরূপতা থেকে মুক্তির তীব্র অভীপ্সায় চল্লিশের অনেক কবি যেমন রোমান্টিক লিরিক-প্রবণতার দিকে ঝুঁকেছিলেন তেমনই লিরিকের প্রতি প্রথমাবধি আস্থা রেখেই কাব্যচর্চা করেছিলেন আর-একদল কবি। যাঁরা রাজনৈতিক আবহজাত বিষয় বদলে নিলেন; তাঁদের কবিতার ভাষায় উঠে এল—

আমি গাছে রসের মতো প্রবাহিত হই
তোমাকে ফুটিয়ে তুলব
জল নড়ে না একটুও
ছায়া দোলে না কোথাও
নিস্পন্দ মাটি থেকে তোমায় ফোয়ারায় ওঠাব আমি।

('কয়েকটি কথা', অরুণ মিত্র)

সমস্ত কবিজীবন ধরে শূন্যতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হিসেবে অরুণ মিত্র ভালোবাসার কবিতা লিখেছেন—

তখন থেকেই শুরু হয়েছে লড়াই
কচি গলায় যখন দুধের ফোঁটা নেমেছে,
শূন্যতার বিরুদ্ধে লড়াই।
তারপর তুমি আপন ক'রে নিয়েছো কত কী

('শূন্যতার বিরুদ্ধে, খুঁজতে খুঁজতে এতদূর')

জীবনের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম আর শরীরের প্রতি অনুরাগ একাকার হয়ে যায় তাঁর কবিতায়—

আমি পলিমাটি ছুঁলেই বুঝি
নিজেদের জগতে এলাম।

('ফসলের সুরে, উৎসের দিকে')

বাংলাদেশের জল-মাটি-হাওয়া, বাংলা মেলা, আমজামের গাঁ, তালপাতার ভেঁপু, ছায়াবটের ঝুরি, কচুপাতায় বৃষ্টির ফোঁটা, তালবনের দিঘিতে বাংলার বৃষ্টির নরম রূপ, ধনধান্যে ও পুষ্পে ভরা দেশের শোভা, ঘুঘু-ডাকা দুপুর, খেজুর গাছে টাঙানো ভাঁড় আর পুকুরের পাড়— স্মৃতির গাঢ় মাধুর্য আর কোমল বেদনায় মিশে বারেবারে অরুণ মিত্রের কবিতায় আসে।

অশোকবিজয় রাহা-র (১৯১০-১৯৯০) কবিতা কোমলে-কঠোরে বিচিত্ররূপিণী। আরণ্যক প্রকৃতিই হোক, কিংবা মানুষের প্রতিদিনের আনন্দ-বেদনাই হোক, তাঁর লেখনীর জাদুস্পর্শে আমাদের পরিচিত জীবন ও জগৎ এক অপরূপ সত্তায় রূপান্তরিত হয়। অভিনব রূপকল্প নির্মাণে তাঁর সমকক্ষ কবি দুর্লভ। তাঁর কবিতায় আঞ্চলিক পরিবেশের প্রভাব সুস্পষ্ট। তাঁর জীবনের প্রথম চল্লিশ বছর অসমে কেটেছে। সেখানকার পার্বত্য-প্রকৃতি ও পার্বত্য-জীবনের চিত্রবিচিত্র ছায়া তাঁর কাব্যে পড়েছে। কবি শ্রীহট্টের মানুষ ছিলেন। বঙ্গ ভাগের আগে শ্রীহট্ট অসমের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর কবিতায় পাই ভাষার কৃত্রিমতা পরিহার ও চিত্ররূপময় প্রতীক উদ্ভাবন—

নদীর ওপারে আকাশে আবির-ঝড়,
আলতা গলেছে জলে,
হাওয়া-জানালায় চোখে মুখে কাঁপে ঝিকিমিকি আবছায়া,
ধু-ধু হাওয়া এলোচুলে,—
দূরে এক কোণে পলাশের ডালে আগুন লেগেছে চাঁদে।

('ফাল্গুন', ডিহাং নদীর বাঁকে, ১৯৪১)

তাঁর অনেক কবিতায় আমাদের দৃষ্টিপথে নানা ছবি ভেসে ওঠে। যেমন

মাথার উপর ডাকল পেঁচা, চমকে উঠি— আরে!
আধখানা চাঁদ আটকে আছে টেলিগ্রাফের তারে!

('একটি সন্ধ্যা', ভানুমতীর মাঠ, ১৯৪২)

টেলিগ্রাফের তারে আটকে-যাওয়া চাঁদের এই দৃশ্য শুধুমাত্র আমাদের চোখের সামনে একটি ছবিই ফুটিয়ে তোলে না, তা আমাদের মনের গভীরে মননকে আলোড়িত করে প্রকৃতি আর আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার সংঘাতের ব্যঞ্জনা জাগিয়ে তোলে। তাঁর কবিতায় সমাজ-সচেতনতাও স্পষ্ট—

মাঠে-মাঠে দুর্ভিক্ষের ভুখা প্রেত নাচে,
চারিদিকে মড়কের অনুচর দল
দেহহীন ছায়া-মূর্তি বুকে হেঁটে ঘোরাফেরা করে,
ভাঙা-হাটে কঙ্কাল কুকুর
ধুলা শোঁকে, ভাঙা হাঁড়ি চাটে।

('ভৌতিক', রক্ত-সন্ধ্যা, ১৯৪৫)

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের (২৭.৩.১৯১৭-৩০.৫.১৯৭৬) নিটোল রোমান্টিক কবিমন, এমন-কি মার্ক্সীয় ভাববাদে নিকষ দীক্ষিত অন্তরঙ্গদের সান্নিধ্যপ্রভাব সত্ত্বেও, স্বপ্নের নীলিমা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে পুরোপুরি আগ্রহবিহীন। তাই প্রায়ই এমন উচ্ছল ভাষা—

আমের মুকুলে ফাগুনের আলো তুলেছে ঢেউ
আমাদের কথা জানে না কেউ।
রজনীগন্ধা ঋজু আর শাদা হ'য়ে
স্মৃতির স্তূপকে আলগোছে ছোঁয়
ভীরু তার হাত দিয়ে।
অনেক পাখির কাকলিতে ভরা সন্ধ্যা
রাত আসে দেখি মৃত্যুর মতো বন্ধ্যা
মনের আকাশ স্তব্ধ বিশাল : ছিল কি কেউ?
আমের মুকুলে ফাগুনের আলো তুলেছে ঢেউ।

('ঢেউ', রাজধানীর তন্দ্রা, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৪৩)

কিন্তু যুদ্ধ, পরাধীন দেশ, সমাজ-বৈকল্য, হয়তো বন্ধুদের দৃষ্টান্ত নয়তো উপরোধ তাঁকে কখনো অন্য কথা ভাবিয়েছে—

আজকে কেন ক্ষিপ্ত লোক?
জ্বলছে কেন রক্ত চোখ?
মানুষ কাটো বাংলা কাটো
ভারত করো খণ্ডিত,
বলছে হিরু, বলে সিরাজ
বলছে মূর্খ পণ্ডিতও।

('১৯৪৭-এর ছড়া', একা, প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৫৪)

সুকান্তের অকালমৃত্যুতে কবি বেদনায় আপ্লুত—

আজকে দাঙ্গার নীতি, কীটজীর্ণ বিবর্ণ জীবন
কিশোর কবির মৃত্যু, দীর্ঘশ্বাসে ভরা প্রতিক্ষণ।
ক্লান্তি আর অবসাদ অন্ধকারে ঘোরে চতুর্দিকে

জীবন-যৌবন সব রঙহীন অবাস্তব ফিকে।

('পুনরুজ্জীবন', একা, প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৩৫৪)

'পরিবেশের উর্ধ্বে যে শিল্পী-আত্মা পক্ষপ্রসারণ করে নিজের আকাশ চায়, সে শিল্পী সহস্র বন্ধনের মধ্যে চির একক'। কথাটি বলেছিলেন 'নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ' গ্রন্থের ভূমিকায় (২৫ বৈশাখ ১৩৬৫) গিরিবালা দেবীর (১৪ ভাদ্র ১২৯৮ বঙ্গাব্দ-১৭ ফাল্গুন ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ) কন্যা বাণী রায় (৫.১১.১৯১৮-১৬.১০.১৯৯২)। চল্লিশের দশকের চিরায়ত প্রেমের, নিসর্গমুগ্ধতার, আত্মমগ্নতার কবি হলেন বাণী রায়। তাঁর রোমান্টিক মন বলে ওঠে—

পাখিকে দিয়েছ তুমি সীমাহীন স্থান,
আমাকে দিয়েছ তুমি সীমাহীন প্রাণ।
কত বার ম'রে ম'রে আসিলাম ফিরে;
শঙ্কিত কম্পিত পায়ে তমসার তীরে।
মরেছি হাজার বার প্রেমের মরণে,
নূপুর বেজেছে কত চরণে চরণে!

('বৎসরের গান')

সময়ের দুর্বিপাক থেকে জীবনানুরাগের উপাদান না-পেয়ে চল্লিশের দশকে লিরিকধর্মিতাও স্পষ্ট হয়ে উঠল কবিতায়—

যদি ম'রে যাই
ফুল হয়ে যেন ঝ'রে যাই;
যে ফুলের নেই কোনো ফল
যে-ফুলের গন্ধই সম্বল;
যে-গন্ধের আয়ু একদিন
উতরোল রাত্রিতে বিলীন;
সেই রাত্রি তোমারই দখলে
আমার সর্বস্ব দিয়ে জ্বলে,
আমার সত্তাকে ক'রে ছাই।
ফুল হ'য়ে যেন ঝ'রে যাই।

('প্রার্থনা', অরুণকুমার সরকার)

রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী (১৯২২-২০০৯) বেদনাপ্লুত ভাষায় অতীতকে ফিরে দেখেন—

ডুবে গেছে কত শান্তির সংসার।
ত্রস্ত গোরুর দুটি চোখ দেখে ভয়,
ধ'রে আছে লোক উঁচু বাড়িটির চুড়ো,
সাহায্য দরকার।
জলে ভাসে ঘর— সান্ত্বনা দরকার।
কাপড় অন্ন নিয়ে উড়ে যায় প্লেন,
তারায় তারায় অনন্ত শাদা রোদ,
শুনতে পারিনে আর।
গণক প্রেমিকে ভিক্ষুকে গুলজার
রূপসী শহর— কোথায় আরশি তার?

('আরশিনগর', কাব্যগ্রন্থ : আরশিনগর)

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় (১০.১২.১৯১৬-২৪.৪.২০০৯) তাঁর সুদূরের কল্পনার বিহঙ্গ উড্ডীনতাকে বারবার বেঁধে নিতে চান দৈনন্দিনে, প্রাত্যহিকে। প্রত্যহকে মেনে নিয়েই কল্পনার মুক্তির দিকে তাঁর যাত্রা। তাই 'কোনো মৃত্যু-শিয়রে— আবহমান' কবিতায় তিনি জীবনের প্রান্তিক কথা শোনান—

যতদিন ধ'রে অঞ্চলে ভ'রে যত গোধূলির আলো
নিয়েছো সে-সব ফ্যালো— এইবার ফ্যালো—
তোমাকে তো আমি বলেছি অনেকদিন
মৃত্যু রয়েছে অলক্ষ্যে, তার উত্তরী উড্ডীন।
শপথ স্বীকৃতি যা-কিছু মাটির সবই কালে হবে কালো।

শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আনন্দবেদনার রোজনামচা না-লিখে সময়কে নিয়ে আক্ষেপ, সময়ের সংলগ্নতার কারণে অসহায়তা, আর্তি চল্লিশের দশকের কবিতায় স্পষ্ট সততায় উচ্চারিত হয়েছিল। কবিতার ঘরোয়া বাতাবরণকে অতিক্রম করে এই সময়ের কবি সমাজের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন। সে-দৃষ্টিতে ছিল পরিচ্ছন্ন মানবতার দৃষ্টি। চল্লিশের দায়বদ্ধ কবিতার ধারায় যা এক স্বতন্ত্র কাব্যিক পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল। কবি হরপ্রসাদ মিত্র (১.১.১৯১৭-১৫.৮.১৯৯৪) 'এসপ্ল্যানেড' কবিতায় লিখছেন—

এখানে শহর লক্ষ কণ্ঠে প্রগল্‌ভ।
এখানে দাঁড়িয়ে এ-মাটি মাড়িয়ে কী বলবো?
যন্ত্রের কথা ফুরোলে বরং রাত্রে— গভীর রাত্রে
হৃদ্‌যন্ত্রের শ্রান্তি ঘুচিয়ো নতুন মদের পাত্রে।
লাগবে বাতাস তৃষিত শরীরে মনে।
গভীর অন্বেষণে—
হয়তো বা দেবে চূড়ান্ত নির্বেদ
বহুমন্থনমুক্ত এসপ্ল্যানেড।

চল্লিশের দশকের কবিতায় প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর ছিল। আর ছিল ছোট ছোট বৃত্ত আঁকার প্রয়াস। কবি নরেশ গুহ-র

(৩.৩.১৯২৩-৪.১.২০০৯) 'দুরন্ত দুপুর' কাব্যগ্রন্থের (১৯৫২) কবিতাগুলির লিরিকধর্মিতা এই সময়ের একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত বলতেই হয়। 'দুরন্ত দুপুর' কাব্য গীতিময় ধ্বনি আর উত্তাপে অনন্য। এই রোমান্টিকতা ও বিস্ময়বোধ আমাদের আবিষ্ট করে—

সারাদিন থাকি এক নদীর পাশেই,
ছোটো এক নদী।
রূপালি প্রলাপ তার স্রোতে উদ্বেল,
আঁকাবাঁকা গতি।
সারাদিন থাকি এক মেয়ের পাশেই,
নদী তার দেহ, তার মন
নিশিদিন ডাকে, তার কণ্ঠ-কুহক
কথা-কওয়া-নদীর মতন।
সারাদিন গান শুনি, কথা শুনি তার,
ভাষা বুঝি নাই।
সারাটি বসন্ত ভ'রে দেখেছি দীঘল
মায়াবিনী চোখের দোহাই।

('দুই নদী')

চল্লিশের কবিতায় এই প্রাণের স্পন্দন ছিল অকৃত্রিম। বিদ্রোহের বাণী, পুঁজিবাদীর প্রতিরোধী সংকল্প, জবাকুসুমসংকাশ প্রভাত, দুরন্ত দুপুর, স্বর্ণাভ সন্ধ্যা বা ভালোবাসার মেদুর স্মৃতি সবই এই সময়ের কবি-লেখনীতে আত্মজ বাণীতে চিত্রময় হয়ে উঠেছিল। চিন্তা, ভাবনা, বৈদগ্ধ্য ও মননের বাতাবরণ থাকলেও তা ছিল ঋজু মানবিকতায় সম্পৃক্ত। কবিতার শিল্পরূপে আঙ্গিক বিন্যাসও বিনত ছিল। অবশ্য তাৎক্ষণিক আবেগ-অন্বিত কাব্যধর্মে গুণাভাস থাকলেও তা ছিল কবির স্বাভাবিক প্রাণের ধর্ম। এখানেই চল্লিশের কবিতার অতুলতা। ❑

দুটি কবিতার শ্রদ্ধার্ঘ্য

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য

ব্যোমকেশ মজুমদার

একাধিক বিষয়ের উত্তর-স্নাতক
প্রত্নতত্ত্ব-রস পানে উৎকণ্ঠ চাতক।
অধিগত ম্লেচ্ছ ভাষা, প্রাণে তবু গোঁড়া,
সনাতনী সমাজের গর্ব দেশজোড়া।
রবি ও বিবেকে ক'রে তীব্র বিদূষণ,
লিখে গেলে বৈজ্ঞানিক-ভ্রান্তি-নিরসন।
উপাধি ব্যাধির মত করিলে বর্জন।
স্বকীয় প্রত্যয়-দৃঢ় ব্যক্তি অতুলন।

[কবিতাটি পদ্মনাথের পৌত্র কলকাতা-নিবাসী শ্রী শক্তিপ্রসাদ ভট্টাচার্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত। 'স্মরণীয়েষু' শীর্ষক এক গ্রন্থে ব্যোমকেশ মজুমদার বিশ্বের ১০৭ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রশস্তিমূলক কবিতা রচনা করেছিলেন, উল্লিখিত কবিতাটি সেই বইয়ের ৪০ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। কবিতাটিতে যে-সব প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে তার মধ্যে রয়েছে 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ' নামক গ্রন্থে পদ্মনাথ কৃত স্বামী বিবেকানন্দের তীব্র সমালোচনা, রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' ও 'চোখের বালি' উপন্যাস দুটির কঠোর নিন্দা এবং ন্যায় ও স্মৃতি-শাস্ত্রের প্রতি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের শ্লেষাত্মক মন্তব্যের প্রতিবাদে 'বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি নিরসন' নামক পুস্তিকা প্রকাশ আর সেইসঙ্গে 'সারদা' আইন প্রণয়নের প্রতিবাদে ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'মহামহোপাধ্যায়' খেতাব বর্জন। 'স্মরণীয়েষু'-র প্রথম প্রকাশ ১৯৭৯-এর নভেম্বর মাসে।]

কবিবর নীলমণি ফুকন, শ্রদ্ধাস্পদেষু

রমানাথ ভট্টাচার্য

[অন্ধকারে আলো হাতে ভার্জিলের মতো পথ দেখাতেন কবি নীলমণি]

শ্রদ্ধাপ্লুত নমস্কার কবি নীলমণি,
আপনার কাছে আমি বহু ঋণে ঋণী;
অন্ধকারে আলো হাতে রোজ মহাগুণী,
ভার্জিলের মতো পথ দেখাতেন আপ্‌নি।
কবিবর করি রোজ স্তুতি আপনার,
আমার চলার পথে অগ্রজের মতো
সোনাঝরা উপদেশ দিতেন সতত;
আমার অজস্র লেখা ফলশ্রুতি তার।

নমস্কার! নমস্কার! কবি নীলমণি,
হৃদয়ের শীর্ষে রোজ আপনার স্থান;
মনোভূমে চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল অম্লান,
আপ্‌নার বন্দনা করি রোজ গুণমণি।
শ্রদ্ধাপ্লুত নমস্কার কবি নীলমণি,
আপনার কাছে আমি বহু ঋণে ঋণী।

১০.১০.২০১২
মুম্বাই

রবীন্দ্রনাথ ও পদ্মনাথ

নৃপেন্দ্রলাল দাশ

রবীন্দ্র প্রশস্তি-প্রণেতা নন পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ। তিনি রবীন্দ্র-সমালোচক, তবে রবীন্দ্র-বিদূষক নন। এমন-কি বিশ্বকবির বিখ্যাত নিন্দুক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়েরও তিনি তীব্র সমালোচক। ফলে রবীন্দ্রবিরোধী চক্রেরও একজন নন তিনি। মত প্রকাশে অকুণ্ঠ এই পণ্ডিত একদিন স্বামী বিবেকানন্দের বিরুদ্ধে লিখেছিলেন। আবার বিশ্বনন্দিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও আক্রমণ করেছেন। তাঁর মত প্রকাশের উগ্রতা শুধু ধমনিতে বহমান কুলধর্মের প্রভাবেই নয়, সনাতনী নীতিধর্মের জন্যও তিনি সোচ্চারকণ্ঠ। তাঁর সাহিত্য-রুচিবোধের দীনতা নয়, নিজ ধর্মের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাই তাঁকে প্ররোচিত করেছে এ-রকম দ্রোহী ও দহনধর্মী হতে।

সম্প্রতি তাঁর 'আলোচনা চতুষ্টয়' সমালোচনা-গ্রন্থটি আমার হস্তগত হয়েছে। দুর্লভ এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল কাশীধাম ব্রাহ্মণ সভা থেকে শকাব্দ ১৮৪৬-এ (১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে)। প্রথম প্রবন্ধটি 'রবীন্দ্রনাথের দুইটি উপন্যাস' ('চোখের বালি' ও 'ঘরে বাইরে')-এর পদ্মনাথ কৃত সমালোচনা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করার আগে তাঁর পরিচিতি সম্পর্কে কিছু তথ্য উপস্থাপন করতে চাই।

১৮৬৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর বানিয়াচঙের বিদ্যাভূষণ পাড়ায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সমস্ত অসমের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন ১৮৭৬ সালে সিলেট রাজকীয় উচ্চ বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দিয়ে। সংস্কৃত, ইংরেজি ও দর্শন বিষয়ে অনার্স নিয়ে ১৮৮০ সালে বি.এ. পাশ করেন। ১৮৮২ সালে ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেন। সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজে অধ্যাপনা দিয়ে কর্মজীবন আরম্ভ করেন। ১৯২২ সালে ইংরেজ সরকার তাঁকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। ঢাকা সারস্বত সমাজ থেকে 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধি লাভ করেন। অসম সচিবালয়ে যোগদান করে শিলঙে যান। পরে সুরমা উপত্যকার স্কুলসমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টরের পদ গ্রহণ করেন।

বাংলা ও ইংরেজিতে লেখা তাঁর ১৩টি বই রয়েছে। সেগুলি হল—

১. প্রবন্ধাষ্টক (১৩১৭), ২. হেড়ম্বরাজ্যের দণ্ডবিধি (১৩১৭), ৩. পরশুরাম কুণ্ড ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ (১৩২১), ৪. হিন্দু বিবাহ সংস্কার (১৩২১), ৫. বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তিবিলাস (১৩২১), ৬. রামকুমার চরিত (১৩২৬), ৭. আলোচনা চতুষ্টয় (১৩৩১), ৮. রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ (১৩৩১), ৯. মোহচপটস (১৩৩২), ১০. স্যার গুরুদাস প্রসঙ্গ (১৩৩৫), ১১. কামরূপশাসনাবলী (১৩৩৮), ১২. Mr. Gait's History of Assam (১৩১৫), ১৩. Translations of the penal code of the last king of Cachar

অচ্যুতচরণ চৌধুরী রচিত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থটি প্রকাশনার সমস্ত অর্থ তিনিই দিয়েছিলেন। শুধু তা-ই নয়, নিজের সংগৃহীত যাবতীয় তথ্য তিনি অচ্যুতচরণকে দান করে মহৎ কর্ম সম্পাদন করেছেন। কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি ও শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য লিখিত 'পদ্মনাথ ভট্টাচার্য' নামে তাঁর জীবনী প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে কবিকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য যে-উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল, পদ্মনাথ ছিলেন তার বিরোধী দলে। তৎকালীন পরিষদ-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এ-জন্য তাঁকে চিঠি দিয়েও তাঁর মনোভাব পালটাতে পারেননি। এ-সব তথ্য বিস্তৃতভাবে লিখেছেন উষারঞ্জন ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস দুটি নিয়ে পদ্মনাথের বক্তব্য আমরা শুনব। ধারণা করা যায়, একজন অমুক্তবুদ্ধি গোঁড়া ব্রাহ্মণের দৃষ্টিতেই তিনি উপন্যাস দুটি বিচার করেছেন। শিল্পরসিকের চেয়েও বেশি প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর সনাতনী নীতি ও সংস্কার। এ-জন্য বোধহয় খুব আক্ষেপ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে 'ঘরে বাইরে' নামে উপন্যাস "অশুভলগ্নে লিখেছিলাম"।

গৌহাটি (গুয়াহাটি) সনাতন ধর্মসভা থেকে প্রকাশিত 'বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তিবিলাস' ও 'হিন্দু বিবাহ সংস্কার' বইয়ে তাঁর স্বধর্ম ও সমাজের প্রতি দায়মুক্তির কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নিয়ে আলোচনায় তাঁর মনোভাব কী ছিল তা গ্রন্থের ভূমিকা-লেখক যাদবেশ্বর তর্করত্ন ভট্টাচার্য মহোদয়ের উক্তি থেকেও জানতে পারি—

"সুশিক্ষিত যুবক-যুবতীর বিবাহের ফল মন্দ, ইহাই দেখাইতে যাইয়া কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি' ও 'ঘরে বাইরে' লিখিয়াছেন, এ-কথা আমি প্রবন্ধান্তরে বলিয়াছিলাম। পরন্তু শ্রীমান বিদ্যাবিনোদ তত্ত্ব সরস্বতী মনে করেন, আধুনিক কতিপয় পাশ্চাত্য লেখকের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ ঐ দুইউপন্যাসে পরকীয়া নারীর সহিত অপর পুরুষের প্রসঙ্গ [আনিয়া] সমাজের ঘোরতর অনিষ্ট করিয়াছেন। তাই শ্রীমান স্বল্পাক্ষরে অথচ তীব্রভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ করিয়া সমাজের হিত সাধন করিয়াছেন।"

'মুখবন্ধে' পদ্মনাথ জানিয়েছেন, তাঁর লেখা প্রথমে 'উপাসনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আষাঢ় ১৩২৪ সনে। ওই বছরই শ্রাবণ সংখ্যায় প্রবন্ধটি 'হিতবাদী'তে প্রকাশিত হয়। কাশীধাম ব্রাহ্মণ সভার 'সমাজ হিতকর গ্রন্থমালা'র প্রথম গ্রন্থ হিসেবে ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস নিয়ে তৎকালীন সাহিত্যজগতে আলোড়ন তুলেছিলেন রক্ষণশীলরা।

পদ্মনাথ রবীন্দ্র-বিরোধী ছিলেন, সে-কারণেই উপন্যাসটি সম্পর্কে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন। 'ব্রাহ্মণ সমাজ' পত্রিকার ভাদ্র ১৩২০ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'বিলাত যাত্রা' বিষয়ে লিখে তাঁর অপ্রসন্নতার কথা বর্ণনা করেছেন। এমন-কি ১৯১৯ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ সিলেটে এসেছিলেন, তখনও তিনি কবিগুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন কি না সে-জাতীয় কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। শ্রীহট্টবাসীর শ্রদ্ধার্ঘ্যরূপে 'কবি প্রণাম' নামে যে-সংকলনগ্রন্থ বের হয়েছিল, অভিজাত সেই কোষগ্রন্থে তাঁর কোনো লেখা নেই। অথচ তিনি শিলং ও গুয়াহাটিতে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের বিশদ বিবরণ লিখে রেখেছেন তাঁর রচনায়।

'রবীন্দ্রনাথের দুইটি উপন্যাস' শীর্ষক প্রবন্ধের সূচনায় পদ্মনাথ রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাও করেছেন অকুণ্ঠ ভাষায়। "ইতঃপূর্বে দুই-এক স্থলে আমরা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছি এবং এই বর্ত্তমান প্রবন্ধেও করিব; তথাপি প্রথমে বলিয়া রাখি যে, তিনি জগন্ময় যে গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন তজ্জন্য প্রত্যেক বাঙালিরই তিনি ধন্যবাদের পাত্র। তাঁহার প্রতিভা অসাধারণ, লিখিবার ক্ষমতা অতুলনীয়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় তাঁহার এই প্রতিভা ও ক্ষমতা হিন্দু সমাজের কোনও উপকারে লাগে নাই বরং ঘোরতর অনিষ্টই তদ্দ্বারা সাধিত হইয়াছে।"

পদ্মনাথের অভিযোগ, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ছিলেন, এ-জন্য হিন্দুদের মূর্তিপূজা, জাতিভেদ, গুরুবাদ, খাদ্য বিচার, মৃতের পিণ্ডদান ইত্যাদি আচারের প্রতি তাঁর কোনো শ্রদ্ধা ছিল না। বিশেষত নারী জাতি সম্পর্কে নব্য ইউরোপীয় ভাবের আমদানি করার জন্যও তিনি রবীন্দ্রনাথকে আসামি করেছেন। তাঁর ভাষায়, রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি' ও 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে যে-নারীচরিত্র অঙ্কন করেছেন তা ভয়ংকর। "তাহাতে ভবিষ্যৎ ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়।" 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের বিমলা চরিত্রটি তাঁর ভাষায় নীতিশাস্ত্রের বিচারে দুষ্ট। 'বন্দে প্রিয়াং বন্দে মোহিনীং' বলে সন্দীপ যে বিমলার গুণবর্ণনা করে তাতে স্বামী হিসেবে নিখিলেশের নির্বিকার থাকাও অশোভন।

ব্যক্তিগত আক্রমণও অনেক। কবিগুরুকে যে অনেক স্তাবক 'ঋষি' আখ্যায় ভূষিত করেছে এবং রবীন্দ্রনাথ তখন বৃদ্ধ— এই দুটি বিষয়ে কটাক্ষ করে পদ্মনাথ মন্তব্য করেছেন, "এই

বয়সে পরকীয়ার প্রতি এত আবেগবিশিষ্ট চিত্র এই রূপ প্রায় নগ্নভাবে আঁকিয়া দেখানোটা কেমন দেখায়?" পদ্মনাথ 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের বিমলাকে বলেছেন 'রবীন্দ্ররূপী বিমলা'। অর্থাৎ বিমলার মুখে যে-সব সংলাপ আছে তা রবীন্দ্রনাথেরই। 'চোখের বালি'র ব্রহ্মচারিণী বিধবা অন্নপূর্ণা এবং পতিপ্রাণা আশালতার প্রতি তিনি [পদ্মনাথ] প্রসন্ন কিন্তু বিমলার প্রতি ভীষণ বিরূপ।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম'-এর বিস্তৃত বিড়ম্বনা করেছেন বলেও অভিযোগ করেছেন পদ্মনাথ, কিন্তু তার কোনো বর্ণনা দেননি। বঙ্কিমকেও সমালোচনা করেছেন এ-লেখায়। "বঙ্কিমবাবু বিষবৃক্ষে যে গরল আনিয়াছিলেন, তাহাতে নিজের কোনও স্নেহভাজনেরও নাকি শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছিল। বোধ হয় ইহা ভাবিয়াই 'দেবী চৌধুরাণী'কে বঙ্কিমবাবু সপত্নীর ঘরেও নিষ্কামভাবে কিরূপে থাকা যায় সেই চিত্র দেখাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন।"

'ঘরে বাইরে'র সন্দীপ চরিত্রটিকে পদ্মনাথ 'প্যারোডি' চরিত্র বলেছেন। অনেকের ধারণা, বাগ্মী ও রাজনীতিবিদ-লেখক বিপিনচন্দ্র পালের অনুকরণে সন্দীপ চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এ-বিষয়ে সম্ভাবনার ক্ষেত্রসমূহকে আমি বিশ্লেষণ করেছি আমার 'শ্রীভূমি সিলেটে রবীন্দ্রনাথ' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে।

ড. সত্যব্রত দে তাঁর গবেষণাগ্রন্থ 'রবীন্দ্র উপন্যাস সমীক্ষা'-য় 'ঘরে বাইরে' শীর্ষক অধ্যায়ে এ-বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, বিপিনচন্দ্র পালের রাজনৈতিক নীতি ও পন্থার সঙ্গে সন্দীপের অবাক-করা মিল রয়েছে। সম্ভবত পদ্মনাথ সরস্বতী সেদিকেই লক্ষ করে এ-মন্তব্য করেছেন।

আবার অন্যরকম তথ্যও পাওয়া যায়। "শ্রদ্ধাস্পদ যদুনাথ সরকার বলিয়াছেন যে সন্দীপ চরিত্রে কবি অরবিন্দের স্বাদেশিকতাকে বিদ্রূপ করিয়াছেন।" পদ্মনাথের সমালোচনার ভাষা কোথাও কোথাও সৌজন্যের সীমাকে পর্যন্ত বিধ্বস্ত করেছে: "রবীন্দ্রনাথ 'ঋষি' পর্যন্ত উঠিয়াছেন এখনও অবতার হন নাই। তবে বাঙ্গলার মাটিতে যেরূপ অবতারের আমদানি দেখা যায় তিনি যে কালে না হইবেন কে জানে?" রবীন্দ্রনাথ 'কোনও উদ্দেশ্য দ্বারা পরিচালিত' হয়ে এ-উপন্যাস লেখেননি এ-রকম অভিমতের বিরোধিতা করেই বলেছেন, "সন্দীপ চরিত্রে তিনি কোনও সুপ্রসিদ্ধ বক্তাকে প্যারোডি করিয়াছেন।" আর সেই 'সুপ্রসিদ্ধ বক্তা'ই হচ্ছেন বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল।

এ-বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ হয়তো আছে, তবু ঐতিহাসিক সাপেক্ষতাকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকুশলতা অসামান্য', বিশ্ময় তিনি পরিচিত এ-সব উক্তি করার পর পদ্মনাথ বলেছেন, রবীন্দ্রনাথেরও 'দোষ' দেখানো কর্তব্য, কারণ তিনি [পদ্মনাথ] স্ব-সমাজ হিতব্রতী। নিজের সমাজ-হিতকারী ভূমিকাকেই পদ্মনাথ প্রাধান্য দিয়েছেন। উপন্যাসের শিল্পরূপ, চরিত্র চিত্রণ, আখ্যানভাগ ইত্যাদি বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। শিল্পের দায়ভাগ বিষয়ে তিনি একেবারেই ভাবিত নন। তাঁর মধ্যে প্রবল ছিল ব্রাহ্মণোচিত জাত্যভিমান ও রক্ষণশীল হিন্দুদের নীতিবোধ। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি বিচার করেছেন রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস দুটি।

এ-সম্পর্কে পদ্মনাথের জীবনীকার অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের মন্তব্য ও বিশ্লেষণ জানা যেতে পারে— "তাঁহার (পদ্মনাথের) মত প্রাচীন ঐতিহ্যে আস্থাবান ও শ্রদ্ধাবান নৈষ্ঠিক ব্যক্তি সচরাচর দুর্লভ। সনাতন ধর্মের উপর তাঁহার গভীর আস্থা ছিল এবং তাঁহার এই আস্তিক্য নিষ্ঠা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহিত যোগাযোগেই প্রমাণিত।"

পদ্মনাথের স্পষ্ট মনোভাব এ-লেখায় প্রকাশিত হয়েছে। কোনো সত্যসন্ধানী গবেষক সহজেই তাঁর সাহিত্যদৃষ্টিকে শনাক্ত করতে পারবেন। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র এই সংস্কৃতের পণ্ডিত কীভাবে সৃজনক্ষমতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন— সেটাই দেখায় বিষয়, উপভোগের বিষয়। □

তথ্যসূত্র:

১. পদ্মনাথ ভট্টাচার্য - রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ, শকাব্দ ১৮৪৬ (কাশীধাম), সমাজ হিতকর গ্রন্থমালা-২; এই বইয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের অনেক সমালোচনা করেছেন। তবে 'আসামে বিবেকানন্দ' প্রসঙ্গে নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি দিয়েছেন। এ-প্রসঙ্গে 'বিবেকানন্দ প্রসঙ্গে পদ্মনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধ আমার 'বিনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (২০১০)।

২. প্রফেসর নিখিল ভট্টাচার্য (হবিগঞ্জ) তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আমাকে বইটি পড়তে দেন। বইটির অন্যান্য তথ্য নিম্নরূপ : সমাজ হিতকর গ্রন্থমালা 'আলোচনা চতুষ্টয়' কাশীধাম ব্রাহ্মণ সভা থেকে শ্রী গোপী চন্দ্র শর্মা সাংখ্যতীর্থ কর্তৃক প্রকাশিত, শকা ঃ ১৮৪৬ (১৯২৪), কাশীধাম ভারত ধর্ম প্রেস থেকে শ্রী হেমেন্দ্রনাথ বাগচী দ্বারা মুদ্রিত। বইটির ভূমিকা লিখেছেন যাদবেশ্বর শর্মা। মূল্য সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই।

৩. নন্দলাল শর্মা - 'সিলেটের সাহিত্য : স্রষ্টা ও সৃষ্টি' (আগস্ট ২০০৯), সিলেট, পৃ. ২৩৪।

৪. উষারঞ্জন ভট্টাচার্য - 'কবি ও কুইনী এবং অন্যান্য', প্যাপিরাস, কলিকাতা-৭০০০০৪।

৫. যাদবেশ্বর তর্করত্ন - ভূমিকা 'আলোচনা চতুষ্টয়', পৃ. ৯।

৬. দেবীপদ ভট্টাচার্য - 'উপন্যাসের কথা', পৃ. ২২৭।

৭. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত - 'রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ৩১১।

৮. যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য - 'পদ্মনাথ ভট্টাচার্য', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃ. ১৭।

[রচনাটি লেখক নৃপেন্দ্রলাল দাশ-এর 'শ্রীভূমি সিলেটে রবীন্দ্রনাথ' (৩য় সংস্করণ, ২০১২, মুক্তধারা, ঢাকা) শীর্ষক গ্রন্থভুক্ত একটি প্রবন্ধের (পৃ. ১৫২-১৫৬) পুনর্মুদ্রণ।]

২০১০ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী অজিৎ বরুয়া

গত শতকের চল্লিশের দশকে আধুনিক অসমিয়া কবিতার জগতে যে-মুষ্টিমেয় কয়েকজন সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ ও স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন অজিৎ বরুয়া তাঁদের অন্যতম।

প্রয়াত চিত্রমল্ল ও পদ্মলতা বরুয়ার পুত্র অজিৎ-এর জন্ম গুয়াহাটিতে, ১৯২৬ সালের ১৯ আগস্ট। কটন কলেজিয়েট স্কুল থেকে অসমে তৃতীয় স্থান লাভ করে ১৯৪৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৪৭ সালে কটন কলেজ থেকেই ইংরেজি অনার্স-সহ স্নাতক এবং ১৯৪৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এম.এ. পাশ করেন।

অসমিয়া কবিতায় আধুনিকতার বার্তা বহনকারী অজিৎ বরুয়ার প্রথম পর্যায়ের কবিতার মধ্যে রয়েছে 'তীখা', 'হাতুরী', 'মন-কুঁঅলী সময়', 'দুখর কবিতা', 'কিছুমান ব্রোঞ্জর ঢেকীয়া', 'এযোর তামর অর্ঘা', 'চেনর পারত' ইত্যাদি; অতঃপর 'জেংরাই ১৯৬৩'-সহ 'ব্রহ্মপুত্র', 'শব্দ-সংবেদ্য', 'স্বর্ণচম্পা' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যসম্ভার। চল্লিশের দশক থেকে সাম্প্রতিক অতীত পর্যন্ত কবিতার সঙ্গে তাঁর যে দীর্ঘকালব্যাপী একাত্মতা, আধুনিক কবিতার প্রবক্তা টি. এস. এলিয়টের জীবন ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ অধ্যয়ন ও চর্চা, তৎসহ ইংরেজি ও ফরাসি কবিতার তাত্ত্বিক ও নান্দনিক দিকের সঙ্গেও সুপরিচিত হওয়ার মানসে কাব্যতত্ত্বের যে-নিরলস সাধনা তিনি করেছেন— সে-সবের জন্যই তাঁর কবি-পরিচিতি অন্যান্য পরিচয়কে ছাপিয়ে গেছে।

ভারতীয় প্রশাসনিক সেবার (আই.এ.এস) একজন নিষ্ঠাবান অফিসার হিসাবে অসম সরকারের বিভিন্ন পদে কর্মজীবন অতিবাহিত করে নামনি অসমের কমিশনার হিসাবে চাকরিজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৮৬ সালে। তখন পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ ছিল মাত্র একটি ('কিছুমান পদ্য আরু গান', ১৯৮২)। পরবর্তী দুই দশকে, ১৯৮৩-২০০২ সময়কালে গান-কবিতা-অনুবাদ ছাড়াও তিনি সাহিত্য সমালোচনা ও প্রবন্ধের কুড়িটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, একটি উপন্যাস লিখেছেন, সেইসঙ্গে উপহার দিয়েছেন পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ। অসমিয়া ও ইংরেজি ছাড়াও বাংলা, ফরাসি, হিন্দি ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা করেছেন নিষ্ঠাভরে। তাঁর প্রকাশিত বাংলা কাব্যগ্রন্থের নাম 'ব্রহ্মপুত্র, স্কিৎজোফ্রেনিয়া ইত্যাদি' এবং তিনিই গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত বাংলা দৈনিক 'সময় প্রবাহ'-র প্রথম সংখ্যায় (১ জানুআরি ১৯৯০) 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' শীর্ষক উত্তর-সম্পাদকীয় নিবন্ধটি লিখেছিলেন। এ-যাবৎ যে-সব পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন শ্রীবরুয়া তার মধ্যে রয়েছে ভারতীয় ভাষা পরিষদ পুরস্কার (১৯৮৮), সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৯২), অসম সাহিত্য সভার পুরস্কার (১৯৯৩), উইলিয়ামসন মেগর এডুকেশন ট্রাস্ট প্রদত্ত অসম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কার (১৯৯৯) এবং অসম সরকার প্রদত্ত কবি গণেশ গগৈ পুরস্কার (২০১০)।

২০১০ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য

উত্তর-পূর্বাঞ্চলে আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য গত চার দশক ধরেই একটি উজ্জ্বল নাম।

তাঁর জন্ম ১৯৩৯ সালের ৩ অক্টোবর অসমের করিমগঞ্জ জেলার কায়স্থগ্রামে। ঈশানচন্দ্র ও সুকুন্তলা ভট্টাচার্যের কনিষ্ঠ সন্তান বিজিৎ-এর পড়াশোনা নিলামবাজারে বিপিনচন্দ্র হাইস্কুল, শিলঙে সেন্ট এডমান্ডস কলেজ এবং গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৬৬ সালে হাইলাকান্দির এস এস কলেজে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে কর্মজীবন শুরু। ওই বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন ২০০২ সালে।

সাহিত্যের প্রতি বিজিৎ-এর অনুরাগ কৈশোরকাল থেকেই। বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকার সময়েই 'তরুণ' নামের এক সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনা করেন (১৯৫৪-৫৬), শিলঙে ছাত্রাবস্থায় সম্পাদনা করেন 'মুরজ', 'মৌসুমীরাগ' (১৯৬১-৬৩)। কর্মজীবনে প্রবেশের পরে তাঁর সম্পাদনায় হাইলাকান্দি থেকে ১৯৬৭ সালে প্রকাশ পায় ত্রৈমাসিক 'সাহিত্য'। পত্রিকাটি চার দশকেরও বেশি সময় ধরে অস্তিত্ব বজায় রেখে এই অঞ্চলের লিট্‌ল ম্যাগাজিনের ইতিহাসে এক অনন্য নজির সৃষ্টি-সহ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্র তখন তাঁর লেখা 'দৃশ্যে নায়িকার অনুপস্থিতিতে' সেখানে মঞ্চস্থ হয়ে শ্রেষ্ঠ নাটকের পুরস্কার লাভ করে ১৯৬৫ সালে।

বিজিৎ-এর প্রকাশিত কাব্যসংকলনের সংখ্যা আট— ১৯৭১ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কেউ পরবাসী নয়', এরপর ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায় 'জেগে আছে স্তব্ধতায়', 'সুন্দর যেখানে খেলা করে', 'মহাভারত কথা', 'পুনর্ভবা', 'ও ছেলে বাউল ছেলে', 'ভালো আছি সকলের সঙ্গে ভালো আছি' এবং 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'। তাঁর সম্পাদিত 'এই আলো হাওয়া রৌদ্রে' (১৯৬৯) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কবিদের এক মলাটের মধ্যে স্থান দেওয়ার প্রথম প্রচেষ্টা; শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একত্রে সম্পাদনায় সংকলনটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। অন্যান্য যে-সব গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেছেন তার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন সময়ে 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অনুবাদ ইত্যাদি নিয়ে ছয় খণ্ডের 'নির্বাচিত সাহিত্য'; 'অতন্দ্র এবং বরাক উপত্যকার বাংলা কাব্যচর্চা', 'শিলচর সঙ্গীত বিদ্যালয় এবং বরাক উপত্যকার সঙ্গীতচর্চা' এবং 'বরাক উপত্যকায় চারুকলাচর্চা'। তাঁর রচিত প্রবন্ধের বইগুলির নাম যথাক্রমে 'সুরক্ষিত বন্দিশালা', 'বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় ভুবন', দুই খণ্ডে 'উত্তর পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য', 'সাহিত্যের সাতকাহন' এবং '১৯শে মে এবং আসামে বাঙালির অস্তিত্বের সংকট'। শ্রীভট্টাচার্যের স্মৃতিমূলক সুপাঠ্য রচনা 'বিকেলের আলো' প্রসাদগুণে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, প্রশংসিত হয়েছে। বর্তমানে তাঁর আরও একটি স্মৃতিকথা 'দিনান্তের বৈঠক' এবং উপন্যাস 'পটভূমি' শিলচরের দুটি পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে।

বিজিৎ বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন, যার মধ্যে 'সাহিত্য' পত্রিকার জন্য 'লিট্‌ল ম্যাগাজিন পুরস্কার ১৯৯২', একই বছরে সেরা সম্পাদক হিসাবে 'অনির্বাণ' পুরস্কার, বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন কর্তৃক 'জীবনানন্দ শতবার্ষিকী পুরস্কার' (১৯৯৯) এবং 'রামকুমার নন্দী মজুমদার স্মৃতি পদক' (২০০২), গুয়াহাটিতে 'একা এবং কয়েকজন' পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রদত্ত 'সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মান ও স্মারক' (২০০২) এবং কলকাতায় 'সাহিত্য-সেতু' পুরস্কার (২০০৬) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ-ছাড়াও গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অসম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত বক্তা হিসাবে বিভিন্ন সময়ে অংশগ্রহণ করেছেন।

২০১১ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক

শ্রী হীরেন ভট্টাচার্য

তিনি ছবি আঁকেন, গান লেখেন। তাঁর কবিতায়ও তাই অনায়াস চিত্রধর্মিতা, অন্তর্লীন সুরের প্রবাহ, যা নিছক গীতিময়তা নয়।

বর্তমানে সৃষ্টিশীল অসমিয়া কবিদের মধ্যে হীরেন ভট্টাচার্য প্রবীণতম হয়েও সবচেয়ে জনপ্রিয়। তাঁর চেহারায় যেমন কোনো বিশেষত্ব খোঁজার চেষ্টা বৃথা তেমনই মানুষটিও খুবই সাদাসিধে। পোশাকে পারিপাট্যের বালাই নেই, যেমন-তেমন একটা ট্রাউজার ও হাফশার্ট হলেই তাঁর চলে যায়, কখনো-কখনো কাঁধে থাকে একটা ঝোলা, শীতকালে সোয়েটারের সঙ্গে মাফলার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে ভালোবাসেন, কিন্তু বক্তৃতা দিতে হলে দু-চার মিনিটের বেশি ব্যয় করেন না। তিনি কবি-সাহিত্যিক-গায়ক-শিল্পী সহ সাধারণ মানুষের এতটাই আপনজন যে 'হিরুদা' নামেই সকলের কাছে পরিচিত।

প্রয়াত তীর্থনাথ ও স্নেহলতা ভট্টাচার্যের পুত্র হীরেনের জন্ম উজান অসমের যোরহাটে, ১৯৩২ সালের ২৮ জুলাই। ছোটবেলা কেটেছে যোরহাট ছাড়াও ডিব্রুগড়, গোলাঘাট ও তেজপুরে। গুয়াহাটির কটন কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেন ১৯৪৯ সালে। কলেজ-জীবন সুশৃঙ্খল ছিল না, শেষে গুয়াহাটিরই বি. বরুয়া কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায় ইতি।

পঞ্চাশের দশকে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের গুয়াহাটি শাখায় যোগদান এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য-কর্মী। কিছুদিন এক গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা, পরে বিভিন্ন প্রেসে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করেছেন। ছিলেন আকাশবাণীর গুয়াহাটি কেন্দ্রের নিয়মিত গীতিকার। সাম্যবাদী কবি হীরেনের রচনায় প্রকৃতি ও মানব-প্রেমের আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ করা যায়, যেখানে মিশে থাকে মাটির গন্ধ এবং সেইসঙ্গে রোমান্টিকতাও।

তাঁর প্রথম কবিতা-সংকলন 'মোর দেশ মোর প্রেমর কবিতা' প্রকাশ পায় ১৯৭২ সালে, যদিও লেখালিখির শুরু পঞ্চাশের দশকের শেষদিকে। অসমিয়ার মতোই বাংলা ভাষায়ও তিনি সমান দক্ষ। চারটি বাংলা কাব্য-সংকলন সহ তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা আঠারো, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'কবিতার র'দ' (১৯৭৬), 'সুগন্ধি পখিলা' (১৯৮১), 'শইচর পথার মানুহ' (১৯৯১), 'জোনাকি মন ও অন্যান্য' (বাংলা, ১৯৯১), 'মোর প্রিয় বর্ণমালা' (১৯৯৬), 'ভালপোয়ার বোকামাটি' (১৯৯৬), 'ভালপোয়ার দিকচৌ বাটেরে' (২০০০), 'সিপার পরা পাতালেকে' (২০০৯), 'বৃষ্টি পড়ে অঝোরে' (বাংলা, ২০১১) প্রভৃতি।

এ-পর্যন্ত যে-সব পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন শ্রীভট্টাচার্য তার মধ্যে রয়েছে 'বিভিন্ন দিনর কবিতা'র জন্য অসম সাহিত্য সভা প্রদত্ত রঘুনাথ চৌধারী পুরস্কার (১৯৭৬), 'সুগন্ধি পখিলা'র জন্য ১৯৮৫ সালে অসম সাহিত্য সভা প্রদত্ত বিষ্ণু রাভা পুরস্কার, একই বছরে একই গ্রন্থের জন্য ভারতীয় বিদ্যা ভবন প্রদত্ত রাজাজি সাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৭ সালে ওই বইয়ের জন্যই সোভিয়েত দেশ নেহরু পুরস্কার, 'শইচর পথার মানুহ'-এর জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৯২), উক্ত গ্রন্থের জন্য ভারতীয় ভাষা পরিষদ প্রদত্ত বাজালিনী পুরস্কার (১৯৯৩), উইলিয়ামসন মেগর এডুকেশন ট্রাস্ট প্রদত্ত অসম উপত্যকা সাহিত্য পুরস্কার (২০০০) এবং অসম সরকার প্রদত্ত গণেশ গগৈ পুরস্কার (২০১০)। এ-ছাড়াও উত্তরপ্রদেশ হিন্দি সংস্থান-এর পক্ষ থেকে পেয়েছেন সৌহার্দ্য সম্মান।

পদ্মনাথের নামাঙ্কিত স্মৃতিপুরস্কারটি গ্রহণের প্রায় সাড়ে তিন মাস পরে ৪ এপ্রিল তাঁর দেহাবসান ঘটে।

২০১১ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক

শ্রী পবিত্র মুখোপাধ্যায়

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে বিশিষ্ট প্রকাশনা সংস্থা 'সিগনেট' থেকে 'দর্পণে অনেক মুখ' বেরনোর পরই অনেককে চমকে দিয়েছিলেন, স্থান করে নিয়েছিলেন আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে। পরের বছরই, ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় 'শবযাত্রা'— যা নিছক দীর্ঘকবিতা নয়, 'মহাকবিতা' আখ্যায় ভূষিত হয়ে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের সৃষ্টিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করে, যেখানে আজও তিনি অনন্য।

রোহিণীকান্ত ও যোগমায়া মুখোপাধ্যায়ের পুত্র পবিত্রের জন্ম পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) বরিশাল জেলায়, ১৯৪০ সালের ১২ ডিসেম্বর। বাল্যেই মাতৃবিয়োগ এবং মাসির স্নেহে বড় হয়ে ওঠা, তারপর দেশভাগের বলি হয়ে কলকাতায় ছিন্নমূল ও সংগ্রামী জীবনের সূত্রপাত। কৈশোর থেকেই শুরু হয় চরম দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই। ছিল না কোনো স্থায়ী আস্তানাও। পড়াশোনা চালাতে হয় টিউশনি করে। কলেজে পড়ার সময়েই কাজ জোটে ভবানীপুরের সাউথ সাবার্বান স্কুলে— প্রথমে লাইব্রেরিতে, পরে শিক্ষকতা। এম.এ. পাশ করার পর বিদ্যানগর কলেজে অধ্যাপনা।

ছাত্রাবস্থাতেই প্রকাশ করেন ব্যতিক্রমী লিট্‌ল ম্যাগাজিন 'কবিপত্র', এই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে অর্ধশতক অতিক্রম করেছেন। জীবনে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে বারে বারে নিজেকে পালটেছেন, পরিবর্তিত হয়েছে রচনাভঙ্গি এবং তাঁর কলমে জন্ম নিয়েছে 'শবযাত্রা' ('ভাসান'-এ যার পরিসমাপ্তি) ছাড়াও আরও কয়েকটি মহাকবিতা— 'ইবলিসের আত্মদর্শন' (১৯৬৯, যেটি পরে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে 'Iblish Confronts Himself' শিরোনামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন লীলা রায়), 'বিযুক্তির স্বেদরক্ত' (১৯৭২), 'অলর্কের উপাখ্যান' (১৯৮২), 'পরশুরাম পর্ব' (১৯৯৪), 'জতুগৃহে আছি' (২০০৯)। সনেট রচনায়ও তিনি সমান স্বচ্ছন্দ।

আশির দশকে কবিতা নিয়ে শুরু করেন নতুন আন্দোলন— 'থার্ড লিটারেচার আন্দোলন', এল 'প্রয়োগবাদী কবিতা'। পবিত্রের নিজের কথায়— "পাঠকের সঙ্গে কবির সম্পর্ক হবে সহমর্মীর, দূরত্বের নয়।... আমাদের কবিতা পড়ে যে-কেউ মনে করতে পারেন, এ-লেখাটা তাঁরই লেখার কথা, কীভাবে যেন অন্য কেউ লিখে ফেলেছে।" এভাবেই তিনি সমসাময়িক কবিদের চেয়ে হয়ে পড়েন স্বভাবত স্বতন্ত্র।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'হেমন্তের সনেট' (১৯৬১), 'আগুনের বাসিন্দা (১৯৬৭), 'দ্রোহহীন আমার দিনগুলি' (১৯৮২), 'ভারবাহীদের গান' (১৯৮৩), 'আমি তোমাদের সঙ্গে আছি' (১৯৮৫), 'আছি প্রেমে, বিষাদে, বিপ্লবে' (১৯৮৭), 'আরোগ্যভূমির দিকে' (১৯৯৪), 'বিষ নয়, উঠেছে অমৃত' (১৯৯৯), 'সন্ধিক্ষণে আছি' (২০০১), 'শোনো স্বপ্নভুক, শোনো (২০০৫), 'আমি ভূতগ্রস্ত কবি' (২০০৭), 'আগুনে সন্ন্যাসে আছি' (২০০৮), 'চেনা পথ অন্ধকার' (২০১০), 'সচেতন স্বপ্নচারী' (২০১১) প্রভৃতি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গদ্যগ্রন্থ : 'বিচ্ছিন্ন অবিচ্ছিন্ন' (১৯৭৪), 'কবির কাজ ও অন্যান্য প্রবন্ধ' (১৯৮১), 'সূর্যকরোজ্জ্বল জীবনানন্দ' (১৯৯৯), 'সত্তার সাম্রাজ্য ও কবিতা' (২০০০), 'কবির দেশ, কবিতার দেশ' (২০০৯), আত্মজীবনীমূলক 'দ্রোহীপুরুষ' (২০০৯) প্রভৃতি।

এ-পর্যন্ত যে-সব পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন পবিত্র তার মধ্যে রয়েছে জীবনানন্দ পুরস্কার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত পুরস্কার, শিলীন্ধ্র পুরস্কার, পদ্মাগঙ্গা পুরস্কার, ভারতচন্দ্র পুরস্কার, বিষ্ণু দে পুরস্কার, প্রেমেন্দ্র মিত্র পুরস্কার, তারাশংকর-বিভূতি পুরস্কার, চোখ পুরস্কার, আমি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার, 'কবিপত্র' সম্পাদনার জন্য পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কর্তৃক সম্মান প্রদান এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনী সম্মাননা।

২০১২ সালের পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক কবি

নীলমণি ফুকন

অনেকের কাছে অসমের 'জীবনানন্দ দাশ' হিসেবে তাঁর পরিচয়, তবে তিনি যে অসমিয়া কবিতায় এক স্বতন্ত্র ধারার স্রষ্টা সে-কথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। একই সঙ্গে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন একজন বিদগ্ধ শিল্প-সমালোচক রূপেও।

কীর্তিনাথ ফুকন ও বরদাবালা দেবীর পুত্র নীলমণির জন্ম উজান অসমের দেরগাঁও-এ, ১৯৩৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। সেখানেই কেটেছে শৈশব ও কৈশোর। দেরগাঁও হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে ভরতি হন গুয়াহাটির কটন কলেজে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬০ সালে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। পরে গুয়াহাটির আর্য বিদ্যাপীঠ কলেজে ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে যোগদান, সেখান থেকেই অবসরগ্রহণ ১৯৯২ সালে।

নীলমণি শুধুই সমাজ-সচেতন কবি নন, দেশ ও রাজ্যের সমকালীন যাবতীয় বিষয় তাঁকে ভাবায়, ব্যক্তিগত অনুভূতিতে জারিত হয়ে উঠে আসে তাঁর কবিতায়। তাঁর অনায়াস বৈদগ্ধ্যের পিছনে রয়েছে বিশ্বসাহিত্যের অনলস অধ্যয়ন। তিনি যেমন খুবই কম লেখেন, তেমনই কবি হিসাবেও তাঁর আত্মপ্রকাশ কিছুটা বিলম্বে। নীলমণির প্রথম কবিতা-সংকলন 'সূর্য হেনো নামি আহে এই নদীয়েদি' প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে, রঙিয়ার 'প্রকাশন ঘর' থেকে। দু-বছর পরে তাঁর দ্বিতীয় কবিতা-সংকলন 'নির্জনতার শব্দ' প্রকাশ পায় গুয়াহাটির বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা 'দত্ত বরুয়া' থেকে। এখন পর্যন্ত আটটি কাব্যগ্রন্থের জনক, যার মধ্যে রয়েছে 'আরু কি নৈঃশব্দ্য' (১৯৬৮), 'ফুলি থকা সূর্যমুখী ফুলটোর ফালে' (১৯৭২), 'কাঁইট, গোলাপ আরু কাঁইট' (১৯৭৫), 'কবিতা' (১৯৮১), 'নৃত্যরতা পৃথিবী' (১৯৮৫) এবং 'অলপ আগতে আমি কি কথা পাতি আছিলো' (২০০৩)।

তাঁর নির্বাচিত কবিতা-সংকলনের সংখ্যা তিন : 'গোলাপী জামুর লগ্ন' (বাণী প্রকাশ, গুয়াহাটি, ১৯৭৭), 'সাগরতলীর শঙ্খ' (ড. হীরেন গোহাঁই সম্পাদিত, লয়ার্স বুক স্টল, গুয়াহাটি, ১৯৯৪) এবং 'নীলমণি ফুকন : সম্পূর্ণ কবিতা' (অর্থাৎ, গুয়াহাটি, ২০০৬)। নীলমণির বাংলায় অনূদিত কাব্যগ্রন্থও তিনটি : 'নির্বাচিত কবিতা : নীলমণি ফুকন' (অনুবাদক তড়িৎ চৌধুরী, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা, ২০০৪), 'পড়োশি গোলাপ : নীলমণি ফুকনের কবিতা' (অনুবাদক রমানাথ ভট্টাচার্য, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০৭) এবং 'নীলমণি ফুকনের কবিতা' (অনুবাদক রবীন্দ্র সরকার, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৭)। তাঁর কবিতার ইংরেজি অনুবাদ-গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে 'সিলেক্টেড পোয়েম্‌স : নীলমণি ফুকন' (অনুবাদক কৃষ্ণদুলাল বরুয়া, সাহিত্য অকাদেমি, নয়া দিল্লি, ২০০৭), তা ছাড়া 'বিচিত্র লেখা', যা কয়েকটি নির্বাচিত গদ্য ও অনূদিত কবিতার সংকলন (বনফুল, ২০১০)। অসমিয়া ভাষায় লেখা তাঁর শিল্প ও শিল্পী বিষয়ক বইগুলি হল 'লোক কল্পদৃষ্টি' (১৯৮৭), 'রূপ বর্ণ বাক্' (১৯৮৮), 'শিল্পকলা দর্শন' (১৯৯৮) এবং 'শিল্পকলার উপলব্ধি আরু আনন্দ' (অন্বেষা, ২০১২)। তাঁর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থটির নাম 'পাতি সোনারুর ফুল' (২০০৬)।

কবি হিসাবে ১৯৮২ সালে নীলমণি ম্যাসিডোনিয়ায় 'স্ট্রুগা পোয়েট্রি ইভনিং'-এ অংশগ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যেই বহু পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : অসম সাহিত্য সভার 'রঘুনাথ চৌধারী পুরস্কার' (১৯৭২), কবিতার জন্য অসম প্রকাশন পরিষদ পুরস্কার (১৯৭৭), সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার (১৯৮১), 'লোক কল্পদৃষ্টি' গ্রন্থের জন্য জগদ্ধাত্রী হরমোহন পুরস্কার (১৯৮৮), অসম সাহিত্য সভার 'ছগনলাল জৈন পুরস্কার' (১৯৯১), কমলকুমারী ফাউন্ডেশন প্রদত্ত 'কমলকুমারী জাতীয় পুরস্কার' (১৯৯৪), উইলিয়ামসন মেগর প্রদত্ত 'অসম উপত্যকা পুরস্কার' (১৯৯৮), ভারতীয় ভাষা পরিষদ পুরস্কার (কলকাতা, ২০০০), জোশুয়া ফাউন্ডেশনের 'জোশুয়া সাহিত্য পুরস্কারম' (হায়দরাবাদ, ২০০১), গঙ্গাধর মেহের জাতীয় পুরস্কার (সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ওড়িশা, ২০০২)। এ-ছাড়া পদ্মশ্রী খেতাব পেয়েছেন (১৯৯০), নয়াদিল্লির মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগের সম্মানিত সদস্য ছিলেন (১৯৯৯-২০০১) এবং ছিলেন সাহিত্য অকাদেমির 'ফেলো'।

২০১২ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপক কবি

তরুণ সান্যাল

তরুণ সান্যাল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সহ বহু বিচিত্র কর্মকাণ্ডের সঙ্গে দীর্ঘকাল জড়িত থাকলেও কবি হিসাবেই তাঁর সমধিক পরিচিতি। তাঁর কবিজীবন আক্ষরিক অর্থেই স্বাধীনতার সমবয়সি। কিশোরদের পত্রিকা 'রামধনু'-তে তাঁর কবিতা প্রথম প্রকাশ পায় ১৯৪৭ সালে, মাত্র পনেরো বছর বয়সে। এবং আজও তাঁর সৃজনশীলতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

আইনজীবী পিতা অশ্বিনীকুমার সান্যাল ও হিরণময়ী দেবীর পুত্র তরুণের জন্ম পূর্ববঙ্গের পাবনা জেলায় শাহাজাদপুর পরগনার পোরজনায় (বর্তমান বাংলাদেশ) ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ অক্টোবর (১২ কার্তিক, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ)। শৈশব, বাল্য ও কৈশোর কেটেছে পোরজনা ছাড়াও বাঁকুড়া, রাজশাহি ও বর্ধমান জেলা এবং কলকাতায়। ১৯৫৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করে ১৯৫৭ সালে কয়েক মাস উত্তরবঙ্গে বালুরঘাট কলেজে অধ্যাপনার পর কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে যোগ দেন। সেখানেই ১৯৫৮ থেকে ১৯৯৪ সালে সহাধ্যক্ষ হিসাবে অবসরগ্রহণ পর্যন্ত কর্মজীবন অতিবাহিত করেছেন।

ছাত্রজীবন থেকেই তরুণ সান্যাল সাহিত্য-সংস্কৃতি ছাড়াও একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। গণ-আন্দোলনে অংশগ্রহণের সুবাদে মাত্র দশ বছর বয়সেই বাঁকুড়ার এক মিছিলে যোগ দিয়ে কাঁদানে গ্যাসে আহত হন। শেষ-কৈশোরেই (১৯৪৯-৫০) নিবর্তনমূলক আইনে গ্রেপ্তার হয়ে বর্ধমান জেলা কারাগারে অন্তরিন হন, পরেও একাধিক বার রাজবন্দি হয়েছেন। সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছেন ১৯৫৯ সালের খাদ্য-আন্দোলনেও। কমিউনিজ্‌মে বিশ্বাসী তরুণ ১৯৬৭-৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট-এর পক্ষে যেমন প্রচারে নেমেছেন, তেমনই যথাযথ ভূমিকা পালন করেছেন ১৯৭১-৭২ সালে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামেও, ওই অস্থির দিনগুলোতে সেখানকার বহু বুদ্ধিজীবীকে আশ্রয়দান ও জীবনযাপনে সহায়তা করেছেন। ছিলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সংস্থার আহ্বায়ক এবং ভারত-সোভিয়েত সংস্কৃতি সমিতির সম্পাদক (১৯৭২-৮১)। ১৯৮১ সালে বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, নাট্য ও চলচ্চিত্র সহ বিভিন্ন আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

তরুণ সান্যালের প্রথম কবিতা-সংকলন 'মাটির বেহালা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। এখন পর্যন্ত মোট কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা চব্বিশ। সাম্প্রতিকতম দুটি কাব্যগ্রন্থ 'বাউকুড়ানির ব্রহ্মডাঙা' (২০০৯) এবং 'হাত ভরা ফুলের গল্প' (২০১০)। 'সর্বেশ্বরী শব্দেশ্বরী', 'মরিয়মের মীরা', 'অচিন পাখির একা', 'সন্ত্রাসে সংলাপে' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য-সংকলন। তা ছাড়া রয়েছে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (দে'জ, কলকাতা), 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' (ঢাকা), 'কবিতা সংগ্রহ' দুই খণ্ড (দে'জ) এবং 'কবিতা সমগ্র' তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড (দিয়া প্রকাশন)। তিনি মোট ৪২টি কাব্যনাটক রচনা করেছেন, তার মধ্যে ৩৫টি গ্রন্থভুক্ত। তাঁর অনূদিত কবিতার বই তিনটি এবং চারটি কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন। প্রবন্ধ-সংকলনের সংখ্যা আট।

যে-সব পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে তরুণ যুক্ত ছিলেন তার মধ্যে রয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের মুখপত্র 'একতা' (১৯৫৫), 'কবিপত্র' (যুগ্মভাবে, ১৯৫৮), 'সীমান্ত' (১৯৬২-৬৭), 'পরিচয়' (যুগ্মভাবে, ১৯৬৭-৭৫), 'রুশ-ভারতী' (১৯৭২-৮১), এ-ছাড়া ২০০২ সাল থেকে সাপ্তাহিক 'সপ্তাহ' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি।

বাংলাভাষায় গত শতকের পঞ্চাশের দশকের বিশিষ্ট কবি হিসাবে চিহ্নিত তরুণ সান্যাল তাঁর বর্ণময় দীর্ঘ জীবনে বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন, যার মধ্যে উল্টোরথ পুরস্কার (১৯৭১), বিষ্ণু দে স্মারক সম্মান, রামমোহন সম্মান, বঙ্গবন্ধু, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় সহ আরও প্রায় ২০টি সম্মান, ভারতভাষা ভূষণ সম্মান (১৯৯৫), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার' (২০০৬), বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সম্মান (২০১২) বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

বানিয়াচঙের রাজবংশ : পরিবর্ধিত কুলপঞ্জি

সংকলন : রমানাথ ভট্টাচার্য

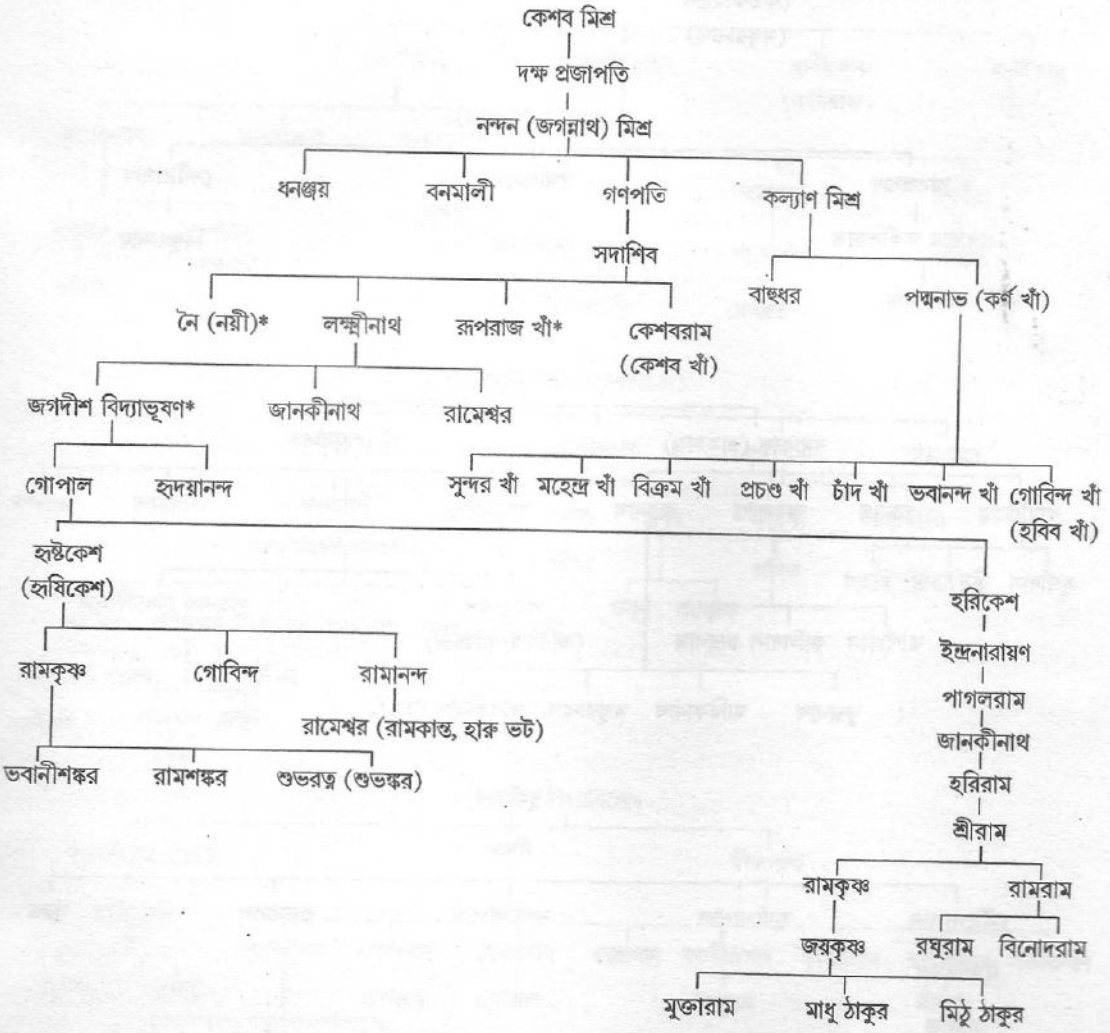

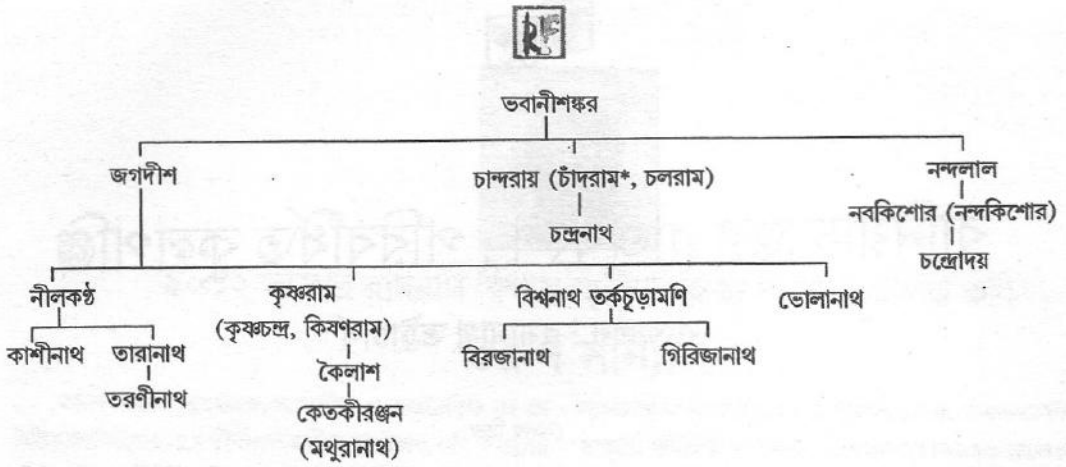
ভবানীশঙ্কর
জগদীশ
চান্দরায় (চাঁদরাম*, চলরাম)
নন্দলাল
চন্দ্রনাথ
নবকিশোর (নন্দকিশোর)
চন্দ্রোদয়
নীলকণ্ঠ
কৃষ্ণরাম
(কৃষ্ণচন্দ্র, কিষণরাম)
বিশ্বনাথ তর্কচূড়ামণি
ভোলানাথ
কাশীনাথ
তারানাথ
তরণীনাথ
কৈলাশ
কেতকীরঞ্জন
(মথুরানাথ)
বিরজানাথ
গিরিজানাথ

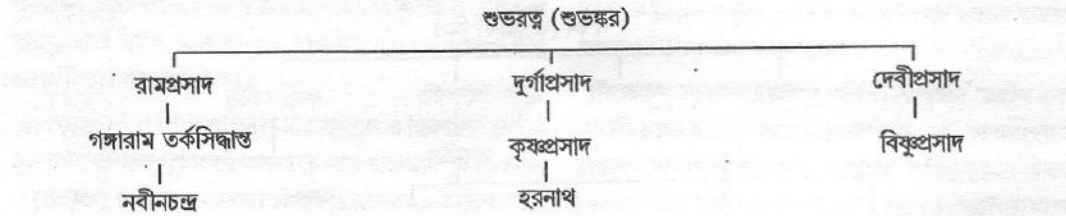
শুভরত্ন (শুভঙ্কর)
রামপ্রসাদ
দুর্গাপ্রসাদ
দেবীপ্রসাদ
গঙ্গারাম তর্কসিদ্ধান্ত
কৃষ্ণপ্রসাদ
বিষ্ণুপ্রসাদ
নবীনচন্দ্র
হরনাথ

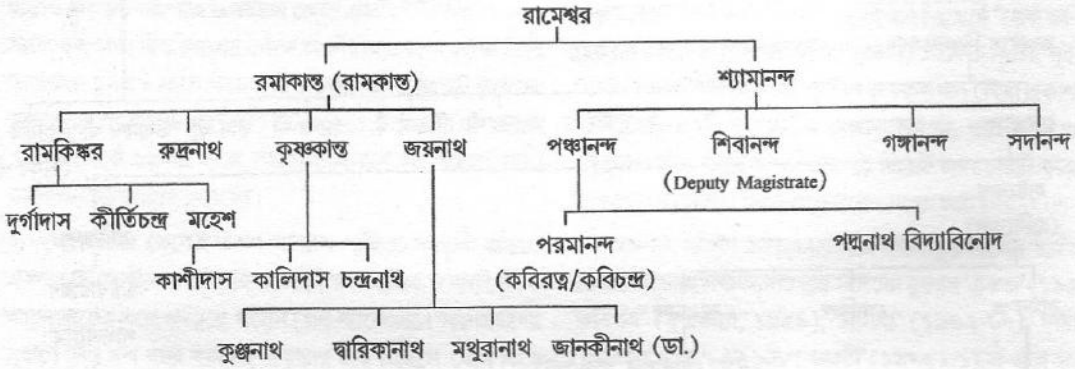
রামেশ্বর
রমাকান্ত (রামকান্ত)
শ্যামানন্দ
রামকিঙ্কর
রুদ্রনাথ
কৃষ্ণকান্ত
জয়নাথ
পঞ্চানন্দ
শিবানন্দ
(Deputy Magistrate)
গঙ্গানন্দ
সদানন্দ
দুর্গাদাস
কীর্তিচন্দ্র
মহেশ
পরমানন্দ
(কবিরত্ন/কবিচন্দ্র)
পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ
কাশীদাস
কালিদাস
চন্দ্রনাথ
কুঞ্জনাথ
দ্বারিকানাথ
মথুরানাথ
জানকীনাথ (ডা.)

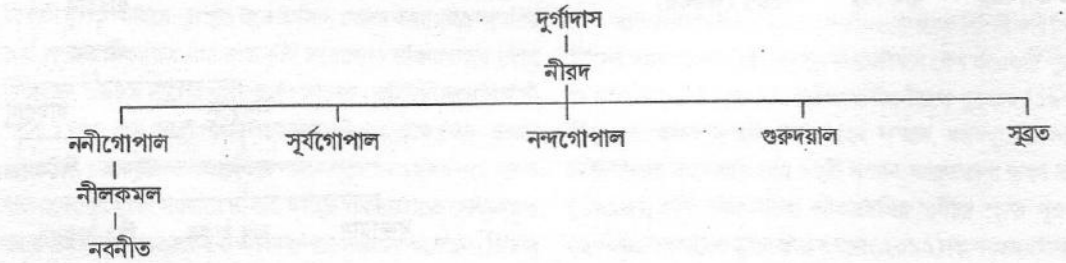
দুর্গাদাস
নীরদ
ননীগোপাল
সূর্যগোপাল
নন্দগোপাল
গুরুদয়াল
সুব্রত
নীলকমল
নবনীত

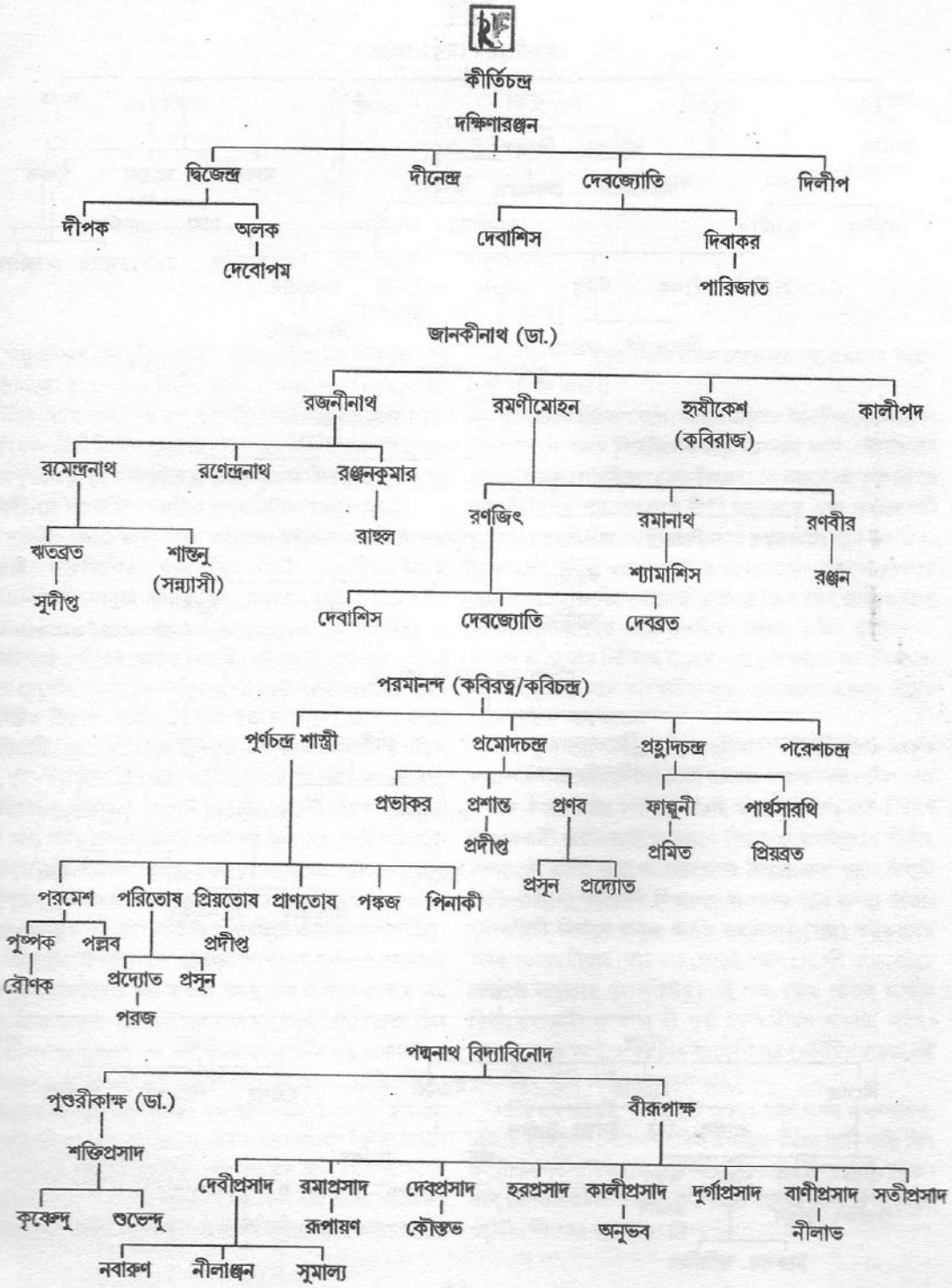
কীর্তিচন্দ্র
দক্ষিণারঞ্জন
দ্বিজেন্দ্র
দীনেন্দ্র
দেবজ্যোতি
দিলীপ
দীপক
অলক
দেবোপম
দেবাশিস
দিবাকর
পারিজাত
জানকীনাথ (ডা.)
রজনীনাথ
রমণীমোহন
হৃষীকেশ (কবিরাজ)
কালীপদ
রমেন্দ্রনাথ
রণেন্দ্রনাথ
রঞ্জনকুমার
ঋতব্রত
শান্তনু (সন্ন্যাসী)
সুদীপ্ত
রাহুল
রণজিৎ
রমানাথ
রণবীর
শ্যামাশিস
রঞ্জন
দেবাশিস
দেবজ্যোতি
দেবব্রত
পরমানন্দ (কবিরত্ন/কবিচন্দ্র)
পূর্ণচন্দ্র শাস্ত্রী
প্রমোদচন্দ্র
প্রহ্লাদচন্দ্র
পরেশচন্দ্র
প্রভাকর
প্রশান্ত
প্রণব
ফাল্গুনী
পার্থসারথি
প্রদীপ্ত
প্রমিত
প্রিয়ব্রত
প্রসূন
প্রদ্যোত
পরমেশ
পরিতোষ
প্রিয়তোষ
প্রাণতোষ
পঙ্কজ
পিনাকী
পুষ্পক
পল্লব
প্রদীপ্ত
রৌণক
প্রদ্যোত
প্রসূন
পরজ
পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ
পুণ্ডরীকাক্ষ (ডা.)
বীরূপাক্ষ
শক্তিপ্রসাদ
দেবীপ্রসাদ
রমাপ্রসাদ
দেবপ্রসাদ
হরপ্রসাদ
কালীপ্রসাদ
দুর্গাপ্রসাদ
বাণীপ্রসাদ
সতীপ্রসাদ
কৃষ্ণেন্দু
শুভেন্দু
রূপায়ণ
কৌস্তভ
অনুভব
নীলাভ
নবারুণ
নীলাঞ্জন
সুমাল্য

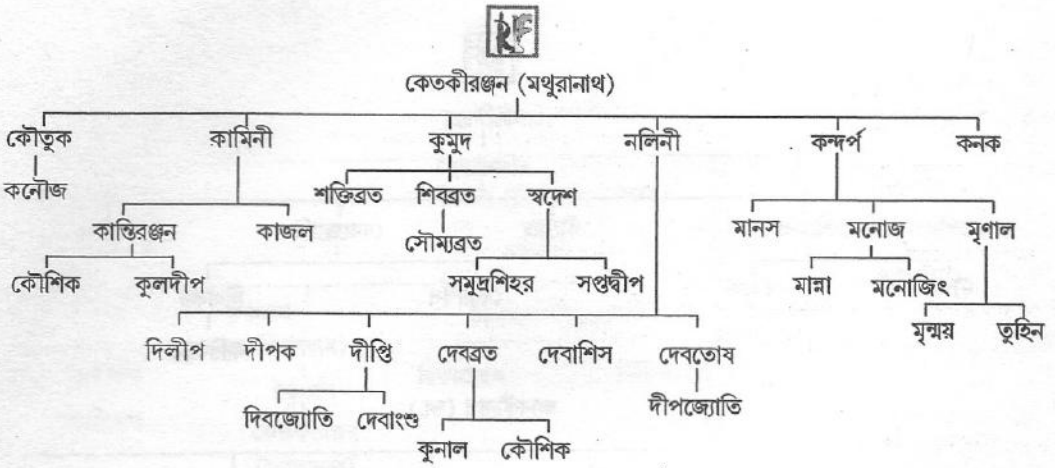
কেতকীরঞ্জন (মথুরানাথ)
কৌতুক
কনৌজ
কামিনী
কান্তিরঞ্জন
কৌশিক
কুলদীপ
কাজল
কুমুদ
শক্তিব্রত
শিবব্রত
স্বদেশ
সৌম্যব্রত
সমুদ্রশিহর
সপ্তদ্বীপ
নলিনী
দিলীপ
দীপক
দীপ্তি
দিবজ্যোতি
দেবাংশু
দেবব্রত
কুনাল
কৌশিক
দেবাশিস
দেবতোষ
দীপজ্যোতি
কন্দর্প
মানস
মনোজ
মান্না
মনোজিৎ
মৃণাল
মৃন্ময়
তুহিন
কনক

বিরজানাথ
কৃপানাথ
ভূপর্যটক রামনাথ
কেদারনাথ
বঙ্কিমচন্দ্র
সত্যনারায়ণ
সমরেন্দ্র
সত্রাজিৎ
মধুসূদন
তপন
চয়ন
সুব্রত

গিরিজানাথ (রায়সাহেব)
মোহিনীমোহন
জিতেন্দ্রনাথ
(স্বামী চণ্ডিকানন্দ)
গিরীন্দ্রনাথ
জ্ঞানেন্দ্রনাথ
বিশ্বজিৎ
গোপেন্দ্রনাথ
অভিজিৎ
প্রসেনজিৎ
প্রত্যয়
গোপিকানাথ
সঞ্জীব
সজল

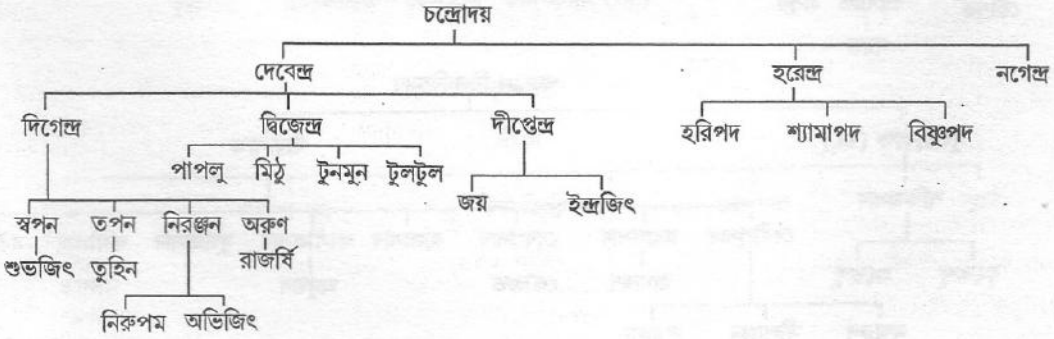
চন্দ্রোদয়
দেবেন্দ্র
দিগেন্দ্র
স্বপন
শুভজিৎ
তপন
তুহিন
নিরঞ্জন
নিরুপম
অভিজিৎ
অরুণ
রাজর্ষি
দ্বিজেন্দ্র
পাপলু
মিঠু
টুনমুন
টুলটুল
দীপ্তেন্দ্র
জয়
ইন্দ্রজিৎ
হরেন্দ্র
হরিপদ
শ্যামাপদ
বিষ্ণুপদ
নগেন্দ্র

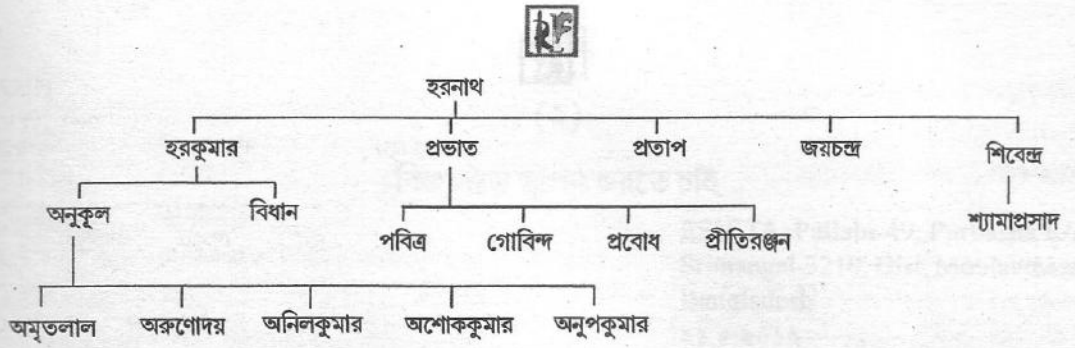

সংকলকের বক্তব্য

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি রচিত 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে (পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬০১-৬০২, দ্বিতীয় 'উৎস' সংস্করণ, জুন ২০০৪, ঢাকা) সন্নিবিষ্ট আছে আমাদের মূল কুলপঞ্জি ('বাণিয়াচঙ্গের রাজবংশ')। নতুন কুলপঞ্জিটি নির্মাণে-পুনর্নির্মাণে উক্ত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কুলপঞ্জি ছাড়াও শ্যামসুন্দর বসুর লেখা ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের জীবনীগ্রন্থ 'রামনাথের পৃথিবী'-তে সংযোজিত আংশিক কুলপঞ্জিটিরও সাহায্য নিয়েছি।

পূজনীয় জ্ঞাতি-কাকা স্বর্গত প্রহ্লাদচন্দ্র ভট্টাচার্য সংকলিত অন্য একটি হস্তলিখিত কুলপঞ্জি, যেটি সন্নিবিষ্ট আছে দিল্লিনিবাসী অনুজ জ্ঞাতি ড. প্রশান্তকুমার ভট্টাচার্যের www.bhattacharyasofsylhet_blogspot.com ওয়েবসাইটে— এ-ব্যাপারে সেটিরও সাহায্য নিয়েছি। এই তিনটি কুলপঞ্জি অধ্যয়ন করে দেখেছি, আমাদের পূর্বপুরুষদের কেউ-কেউ একাধিক নামে পরিচিত ছিলেন। আমি এই কুলপঞ্জিতে তাঁদের প্রতিটি নামই দেখিয়েছি। তবে 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে তাঁরা যে-নামে উপস্থিত নন, তাঁদের সেইসব নাম আমি বন্ধনীর ভেতর রেখেছি। কুলপঞ্জিগুলি গভীরভাবে পাঠ করে দেখেছি (পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে উনিশশো দশ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত), আমাদের কুলপঞ্জি, যেটি 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে সন্নিবিষ্ট আছে, সেখানে আমাদের কোনো-কোনো পূর্বপুরুষ ভুলবশত অনুপস্থিত; অনুপস্থিত পূর্বপুরুষ হরিকেশের উত্তরপুরুষরাও। আমার পুনর্নির্মিত কুলপঞ্জিতে তাঁরা স্বনামে উপস্থিত।

'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জি অনুসারে পূর্বপুরুষ রামকৃষ্ণের ছিল ভবানী, শঙ্কর, রাম ও শুভরত্ন নামে চার পুত্র; কিন্তু প্রাগুক্ত অন্য দুটি কুলপঞ্জি অনুসারে তিনি ছিলেন তিন পুত্রের জনক; পুত্রদের নাম ছিল যথাক্রমে ভবানীশঙ্কর, রামশঙ্কর ও শুভরত্ন (শুভঙ্কর)। এই কুলপঞ্জিতে তাঁরা শেষোক্ত নামেই উপস্থিত। 'শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত'-তে আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ 'রমাকান্ত' রামকান্ত নামে উপস্থিত। আসলে তাঁর নয়, তাঁর বাবার অন্য নাম ছিল রামকান্ত। ওয়েবসাইটে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জিতেও তিনি রমাকান্ত নামেই উপস্থিত। তাঁর উত্তরপুরুষদের কাছেও তিনি ওই নামেই পরিচিত। (রমাকান্তের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অনেকদূর ছড়িয়েছিল। কথিত আছে, বানিয়াচং থেকে সুদূর ঢাকায় তাঁকে যেতে হত মহাভারতের 'বিরাট পর্ব' পাঠের জন্য।)

পারিবারিক ইতিহাস বলে : আমার ঠাকুরদা জানকীনাথের সহোদর মথুরানাথকে দত্তক নিয়েছিলেন তাঁর নিঃসন্তান জ্ঞাতিভাই কৈলাস এবং তাঁর নাম রেখেছিলেন কেতকীরঞ্জন। সে-কারণে এই কুলপঞ্জিতে জানকীনাথের পুরুষানুক্রমে তিনি মথুরানাথ এবং তৎপরবর্তী পুরুষানুক্রমে তিনি কেতকীরঞ্জন (তথা মথুরানাথ) নামে উপস্থিত। 'রামনাথের পৃথিবী'-তে সংযোজিত আমাদের কুলপঞ্জিতে ভুলবশত শ্রদ্ধেয় অগ্রজ জ্ঞাতি 'গোপেন্দ্র' দেবেন্দ্র নামে এবং জ্ঞাতিভাইপো 'তপন' শশাঙ্কশেখর নামে উপস্থিত। আমার নির্মিত কুলপঞ্জিতে তাঁদের সঠিক নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই কুলপঞ্জিতে আমাদের যে-সব পূর্বপুরুষের নাম তারকাচিহ্ন যুক্ত, বানিয়াচঙে এখনও তাঁদের নামে পাড়ার নাম আছে।

এই কুলপঞ্জি নির্মাণে শিলচরনিবাসী আমার অগ্রজ-জ্ঞাতি শ্রদ্ধাস্পদ দেবজ্যোতি ভট্টাচার্যের অবদান অনেক। এই জটিল কাজ সম্পন্ন করার সময় সর্বদা পেয়েছি তাঁর পরামর্শ। এটি নির্মাণে শিলচরবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো স্বদেশ বিশ্বাস ও তপনকুমার বিশ্বাস, শিলংবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো অরুণোদয় বিশ্বাস এবং গুয়াহাটিবাসী জ্ঞাতি-ভাইপো অভিজিৎ বিশ্বাসের অবদানও মনে রাখার মতো। কুলপঞ্জিটি নির্মাণে অনুজ জ্ঞাতি রমাপ্রসাদ (সন্ত) ভট্টাচার্যের অবদানও অনস্বীকার্য। তার কাছ থেকেই সন্ধান পেয়েছি ওয়েবসাইটে সন্নিবিষ্ট আমাদের কুলপঞ্জিটির। এই শুভ কাজে আমার আত্মীয় বিমল গোস্বামী ও তাঁর স্ত্রী পূর্ণা গোস্বামীরও অবদান আছে। এককথায়, বহু আত্মীয়-স্বজনের সহযোগিতায় পুনর্নির্মিত হয়েছে এই কুলপঞ্জি। আমি এটির সংকলক মাত্র।

পরিশেষে জানাই, কুলপঞ্জিটি ২০১১ সাল পর্যন্ত সম্প্রসারিত, এটিতে আমাদের সেইসব জ্ঞাতিই উপস্থিত যাঁদের আদি বাড়ি ছিল তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত বানিয়াচঙের বিদ্যাভূষণ পাড়ায়। তবে দেশভাগজনিত কারণে কুলপঞ্জিটি ষোলো আনা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। কী আর করা যায়। ❑

মতামত

(১)

বেশ আগ্রহ জাগিয়েছে

এ২৩ নেতাজি সমবায় আবাস
পশ্চিম নারায়ণতলা
কলকাতা-৭০০১০১
০৩.০৫.২০১২

প্রীতিভাজন কবি রমানাথ ভট্টাচার্য
স্বজনেষু,

ভাই রমানাথ, চিঠি ও স্মারকগ্রন্থটি গত পরশু ৩০.৪.১২ তারিখে পেয়েছি। চোখের দৃষ্টিতে ঘুণ ধরেছে, কী যে লিখছি চিঠিটিতে ঠিকঠাক দেখছিও না। কবি হীরেন ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরিচয় আছে আমার। বেশ ক'বছর আগে গুয়াহাটিতে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, যেন মনে পড়ি-পড়ি হচ্ছে। তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতেও ঘণ্টাখানেকের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন। পবিত্র তো আমার সহোদর কনিষ্ঠতুল্য। কবি বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের 'সাহিত্য' পত্রিকাটিতে লিখেওছি। বছর দুই আগে কলকাতা বইমেলায় সাক্ষাৎও হয়েছে। বিজিতের 'উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা কবিতা' পড়ে অনেক কিছু জানা হল। শ্যামসুন্দর বসু ও বীরেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা থেকে বহু কিছু জানলাম। প্রশান্ত চক্রবর্তীর রচনাটিও, বিদ্যাবিনোদ বিষয়ে সন্দর্ভটি, আগ্রহ জাগায়। প্রসূন বর্মনের ভাষান্তর চমৎকার। বানিয়াচঙের রাজবংশ বিষয়ে তোমার উৎসাহ ও গবেষণা ওই বংশের বিষয়ে পাঠকের আগ্রহ জাগায়। তা ছাড়া ২০১০-২০১১ দু-বছরের পুরস্কার প্রাপ্তদের উপর রচনাদুটিও আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। এখন তো হাতে অনেক সময়, তাই সব লেখাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ি। তোমাদের স্মারকগ্রন্থ বা অভিজ্ঞান সংকলন আমার বেশ আগ্রহ জাগিয়েছে।

আমার মতে, ওড়িশা, বঙ্গভূমি, মিথিলা ও অসম একই দেশ। ভাষাতত্ত্ব তো জানি না, কিন্তু দূর থেকে শব্দ ও বাক্য উচ্চারণের অনুরণনে একই ভাষাভাষী মনে হয়। স্থানের দূরত্বে, ভিন্ন ভিন্ন ভাষা-বিধৃত ভিন্ন ভিন্ন দেশ ভাবি। একদা দেখা ইউক্রেন, বেলারুশ ও রাশিয়ায় ওইরকম মিল পেয়েছি। বার্লিন ও ভিয়েনাতেও। থাক সে-সব কথা।

তোমরা সবাই শরীরে-মনে, মেধায়-সামাজিকতায় সুস্থ ও সুকল্যাণ থেকো, সপরিবারে। প্রীতি, শুভেচ্ছা ও স্নেহ নিয়ো।

ইতি

তরুণ সান্যাল

(২)

বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করতে চাই

ESHITA, Pallabi-49, Purbasha R/A,
Srimangal-3210, Dist. Moulavibazar,
Bangladesh
২১.৫.২০১২

শ্রীযুক্ত রমানাথ ভট্টাচার্য, মুম্বাই
শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার প্রেরিত স্মারকগ্রন্থ ও চিঠি পেয়েছি গতকাল। আমি আনন্দিত হয়েছি স্মারকগ্রন্থ দুটি পেয়ে। প্রশান্ত চক্রবর্তীর প্রবন্ধ 'পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ : জীবন ও কর্ম' অতি মূল্যবান গবেষণাকর্ম। তিনি পদ্মনাথের ঘটনামুখ্য জীবনকে উপস্থাপন করেছেন বিস্তৃতভাবে, তবে তাঁর সারস্বত সাধনাকে আলোকিত করেননি। প্রতিটি গ্রন্থকে নিয়ে মূল্যায়নধর্মী আলোচনা করলে আরও ঋদ্ধ হত সন্দর্ভটি। রামনাথ বিষয়ে শ্যামসুন্দরের লেখাও গভীরতাস্পর্শী।

আমি অভিনন্দন জানাই পদ্মনাথ ও রামনাথ স্মৃতি পুরস্কার প্রবর্তন করার জন্য। এই দুই পুণ্যশ্লোক শ্রীহট্টীয়ের স্মৃতি সতত জাগরূক হোক। আমি শ্রেষ্ঠ শ্রীহট্টীয় পদ্মনাথের নামে একটি বিজয়স্তম্ভ বানিয়াচঙের বিদ্যাভূষণ পাড়ায় স্থাপন করতে চাই।

কবি বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের ভাষণটি অতি মূল্যবান হয়েছে। তবে কবিদের কাব্যকৃতির চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন লিট্‌ল ম্যাগাজিন বিষয়ে। বীরেন্দ্রনাথ দত্তের আলোচনাটিও ভালো।

আপনার 'বানিয়াচঙের রাজবংশ : পরিবর্ধিত কুলপঞ্জি'টিও অনেক তথ্যবহুল। ইতিহাসের পুনঃপাঠে বিত্তবান।

বিনীত
নৃপেন্দ্রলাল দাশ

(৩)

অসম সম্পর্কে আমার দুর্বলতা বহুদিনের

২/২ এ সেলিমপুর লেন,
কলকাতা-৭০০০৩১

শ্রী রমানাথ ভট্টাচার্য
প্রিয়বরেষু,

এখন লিখতে হাত কাঁপে। গত দেড় বছর নানা অদ্ভুত অসুখে ভুগে এই দশা। তা ছাড়া বয়সও ৭৮। সব মিলিয়ে যা হয় তা-ই হয়েছে— স্বাস্থ্যহানি ও অর্থের শ্রাদ্ধ।

যাক, আপনার পাঠানো সুন্দর স্মারকগ্রন্থটি পেয়েছি। অতি মূল্যবান মনে হয়েছে আমার। ইতিহাস কথা বলেছে স্মারকগ্রন্থটিতে। এই ইতিহাস আমার জানা ছিল না। এমনিতেই অসম সম্পর্কে আমার দুর্বলতা বহুদিনের। রাজ্যটার প্রেমে পড়েছি আমার ছোটবেলা থেকেই। আজও সে-প্রেমে ভাটা পড়েনি। ১৯৯৫ সালে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে নিয়ে একটা সম্মেলনই করে ফেললাম। তার একটা Synopsis আপনাকে পাঠালাম অনেক খুঁজেপেতে। বুঝবেন আমার পাগলামির বহরটা।

খালি আমার কথাই বলে যাচ্ছি। কারণ আপনার স্মারকগ্রন্থটি আমাকে একটু আবেগতাড়িত করেছে। রামনাথ বিশ্বাসের প্রায় সব বই আমি পড়েছি। থ্রিলিং মনে হত তখন। পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ সম্পর্কে অবশ্য আমার কিছুই জানা ছিল না। তাঁকে জেনে বিস্মিত হয়েছি। শ্রী অজিৎ বরুয়ার সঙ্গে আমার কলকাতায় একবার আলাপ হয়েছিল। ভালো বাংলা বলেন। দারুণ রসিক। মুহূর্তে তিনি শ্রোতাকে জয় করে নিতে পারেন। তাঁর সম্পর্কে অনেক জেনেছি কবি গৌতমপ্রসাদ বরুয়ার কাছে। গৌতম নবকান্ত বরুয়ার ভাগ্নে ও কবি। সম্পাদক সুকুমার বাগচির নামও খুব জানি। তিনি 'সময় প্রবাহ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই গ্রন্থটি থেকে আরও জানতে পারলাম আপনি বানিয়াচং রাজবংশের মানুষ। অবশ্য আপনার চেহারা রাজবংশের লোকের মতোই — টকটকে ফর্সা এবং আপনার ব্যবহার, সহজে দান করার মানসিকতা প্রমাণ করে যে আপনি ঋদ্ধ ঐতিহ্যের সন্তান। বীরেন্দ্রনাথ দত্তের বক্তৃতাটি অবশ্যপাঠ্য একটা টেক্সট।

সর্বোপরি এবার আমার প্রিয় ও পরিচিত দুই কবি পুরস্কার পেয়েছেন— এর চেয়ে আনন্দের কী আছে। হীরেন ভট্টাচার্য আমাকে একটা বইও উপহার দিয়েছেন। আর পবিত্র তো ঘরের মানুষ। এঁদের দুজনের সঙ্গেই মঞ্চে কবিতা পড়ার আমার সৌভাগ্য হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে আপনাদের আর-একটু প্রচার দরকার। তবে প্রচারের জন্য আদর্শকে বিকিয়ে দেওয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে মনে করি। কাজ করে যেতে হবে— আজ নয় কাল মানুষ সবকিছু জেনে যাবেই। কেউ আটকাতে পারবে না। ভালো থাকুন— শুভেচ্ছা ও প্রীতি জানবেন।

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

৩১.৫.১২

(৪)

উৎকৃষ্ট মান

কোচবিহার

৬ জুন ২০১২

শ্রী রমানাথ ভট্টাচার্য

আত্মজনেষু,

আপনার পাঠানো ফাউন্ডেশনের আমন্ত্রণপত্র, পরে স্মারকগ্রন্থটি পেয়েছি। স্মারকগ্রন্থটি উৎকৃষ্ট মানের হয়েছে।

অনেক ভালোবাসা রইল।

সুব্রত রুদ্র

(৫)

বিপুল শ্রমসাধ্য কাজ

হাওড়া

০৯.০৬.২০১২

শ্রীযুক্ত রমানাথ ভট্টাচার্য

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

ফাউন্ডেশনের স্মারকগ্রন্থটি অত্যন্ত সুসম্পাদিত। সুকুমার বাগচির 'সম্পাদকীয় নিবেদন', সাধারণ সচিব শ্যামাশিস ভট্টাচার্যের

'প্রাক্-কথন' এবং আপনার 'সবিনয় নিবেদন' তিনটি রচনাই যথাযথ এবং মূল্যবান।

প্রশান্ত চক্রবর্তী রচিত 'পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ : জীবন ও কর্ম' শ্রমসাপেক্ষ অন্বেষণধর্মী একটি গুরুত্বপূর্ণ রচনা। ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের বিশ্বভ্রমণের উপর রোমহর্ষক রচনা পড়েছিলাম কোন্ সুদূর বাল্যে। তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে শ্যামসুন্দর বসুর রচনাটিও চমৎকার।

এ-ছাড়া ফাউন্ডেশনের তরফে দু-বছর চারজন পুরস্কার প্রাপকের উপর প্রতিবেদনগুলিও সুলিখিত। স্মারক বক্তৃতাগুলি খুবই তথ্যসমৃদ্ধ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। প্রতিটি রচনাই মনোনিবেশ করে পড়েছি এবং অনেক অজানা বিষয়ে সমৃদ্ধ হয়েছি। অন্যদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ না-ঘটলেও অধ্যাপক ও কবি বিজিৎ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে কলকাতা বইমেলার সৌজন্যে।

স্মারকগ্রন্থটিতে যা আমার বিস্ময় উদ্রেক করেছে, তা হল 'বানিয়াচঙের রাজবংশ : পরিবর্ধিত কুলপঞ্জি'। কী বিপুল শ্রমসাধ্য কাজ এটি! এ-জন্য ফাউন্ডেশন-সভাপতি এবং বিশিষ্ট কবি হিসেবে আপনার কৃতিত্ব অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য।

ফাউন্ডেশনের মহৎ উদ্দেশ্য আশা করি সুধীজনের প্রশংসা কুড়োবে।

বিনীত

অজিত বাইরী

(৬)

'তরুণ তুর্কী' পড়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বদলে গেছে

শ্রী রমানাথ ভট্টাচার্য

বন্ধুবরেষু,

কলকাতা

জুন ২০১২

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ও রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি পুরস্কারের স্মারকগ্রন্থ পাঠানোর জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

বইটা বহুদিন ধরে অনবরত পড়েছি।

রামনাথ বিশ্বাসের লেখা স্কুলে মুগ্ধ হয়ে পড়েছি শিশুসাথী, শুকতারা এ-সব পত্রিকায়।

'তরুণ তুর্কী' পড়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কামাল আতাতুর্ক দেশকে শুধু স্বাধীনই করেননি, দেশের মানুষের মনকেও স্বাধীন ও আধুনিক করতে পেরেছিলেন। মাদ্রাসা উঠিয়ে দিয়ে স্কুলগুলোতে আধুনিক ইউরোপীয় ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি চালু করেছিলেন। মুসলমানি পোশাক পরা নিষিদ্ধ করে স্মার্ট ইউরোপীয় পোশাক প্রচলন করেছিলেন। রামনাথ বিশ্বাস লিখেছেন, ও-দেশে গিয়ে ওদের news reel-এ দেখেছেন, দলে দলে মোল্লারা ক্ষিপ্ত হয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। কামাল আতাতুর্ক সংকল্পে অটুট। গোঁড়ামি জিনিসটা মুসলমানদের মধ্যে হাড়ে-মজ্জায় এমনভাবে মিশে আছে যে কোনোদিনই তাঁদের আধুনিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোতে আনা যাবে না— এই প্রচলিত ধারণাটা তাহলে ভুল।

রামনাথ বিশ্বাস তুর্কিস্তানের এই জাগরণ নিজের চোখে দেখে এসেছেন। Turkey নিজেদের ইউরোপীয় দেশ বলে ঘোষণা করেছে, ইউরোপও তা মেনে নিয়েছে। রামনাথ বিশ্বাস যে আপনার আত্মীয় তা জানতাম না।

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের নাম আমি শিলচরে দু-একবার উচ্চারিত হতে শুনেছি। তিনি কে, কেন বিখ্যাত কিছুই জানতাম না। অসমের গৌরবময় ইতিহাস, অসমের সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যকে শুধু বাঙালির কাছেই নয়, পৃথিবীর আলোয় নিয়ে আসায় তাঁর অবদান যে কত বিশাল এবারে জানলাম। বাঙালির শভিনিজ্‌ম এবং অজ্ঞতাপ্রসূত উন্নাসিকতাকে পরাক্রমের সঙ্গে আক্রমণ করেছেন। 'কামরূপশাসনাবলী' এবং আরও অনেক চিরস্মরণীয় গবেষণামূলক কাজের সঙ্গে সঙ্গে একের পর এক গবেষণা ও বিদ্যাচর্চার প্রতিষ্ঠান নির্মাণ একজন Colossus, একালে Hercules-এর মতো করে গেছেন— অসমের বাঙালি ও অসমিয়াকে পারস্পরিক

শ্রদ্ধার পুষ্পোদ্যানে বসিয়ে দিয়ে গেছেন।

মার্ক্সবাদ বলে, প্রতিটি জিনিস তার বিপরীত নিয়ে অবস্থান করে। ভালোর সঙ্গে মিশে থাকে মন্দও। দুই বিপরীতের দ্বন্দ্ব এগিয়ে নিয়ে যায়। এক প্রাচীন সভ্যতার ধারাবাহক, অতি উন্নতমনা ও সজীব সংস্কৃতির অধিকারী অসমিয়া সমাজের অতিসচেতন জাতীয়তাবোধ আর শভিনিজ্‌মের পরিণামে যে-মানুষটা অসমিয়া অতীত আর বর্তমানের হিরেমুক্তো উদ্ধার করে পৃথিবীর চোখের সামনে মেলে ধরছিলেন, তাঁর সেই কাজের স্রোত রুদ্ধ হয়ে গেল।

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ যে আপনার আত্মীয় তা জানতাম না।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বীরেন দত্ত মহাশয়ের লেখাটাও বারবার পড়েছি। অনেক কথা জেনেছি, শিখেছি। কিন্তু তিনিও লিখেছেন পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ নিজেকে বাঙালি বলেছেন, অসমিয়া বলেননি— অথচ তখন সিলেট অসমের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। সিলেটের লোকেরা তো এখনও নিজেদের বাঙালি বলে। তখনও বলত। কারণ তারা বাঙালি। বাংলার ভেতরে বলে কি দার্জিলিঙের নেপালিরা নিজেদের নেপালি বা গোর্খালি বলবে না?

আমার প্রিয় বন্ধু বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য অসাধারণ যোগ্যতার সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁর প্রবন্ধে। এই বিষয়ের ওপর এত উঁচু মানের প্রবন্ধ লেখা আর কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। খুব সূক্ষ্ম সাহিত্যবোধ আর কাব্যচেতনা না-থাকলে এতজন ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কবির কবিতার সৌন্দর্যময় দিকগুলি দেখাতে পারতেন না।

বীরেন দত্তের গান আমি গুয়াহাটির জলসায় শুনেছি। লোকসংস্কৃতির বিষয়ে তাঁর বিশ্লেষণও শুনেছি দু-একটা সভায়। ক্লাসিক্যাল সংগীতের মূল ভিত্তিও যে লোকসংগীত সেটা অনেক উদাহরণ দিয়ে উনি স্পষ্ট করেছিলেন। তাঁকে বিশেষ আমন্ত্রিত বক্তা হিসেবে ডেকে আপনি খুবই সফল উৎসব সম্পন্ন করেছেন।

কবি হীরেন ভট্টাচার্যের সঙ্গে এক রুমেই ছিলাম কোহিমায় সাহিত্য অকাদেমির কবি-সম্মেলনে। সারা রাত কত গল্প, কত কথা হত। আমার বিহুগীত অনুবাদের বইটা খুব মনোযোগ দিয়ে পড়লেন। একটা প্রিয় বিহু গীত আছে আমার—

'উকিয়াই উকিয়াই
রেলগাড়ী চলিলে
রঙ্গিয়াত গ'ধূলী হোল'

আমি গাধার মতো লিখেছিলাম—

উকিয়ে উকিয়ে রেলগাড়ি চলেছে, মানে বোঝাতে চেয়েছিলাম— উঁকি দিয়ে দিয়ে রেলগাড়ি যাচ্ছে। হীরেনদা বললেন, উকিয়াই উকিয়াই মানে উঁকি দিয়ে দিয়ে নয়— হুইসেল বাজিয়ে রেলগাড়ি যাচ্ছে। উঁকি দিয়ে যাওয়াকে অসমিয়ায় বলে 'ভুমুকিয়াই'। আমাকে বললেন, বাচ্চাদের জন্যে গাওয়া হয় নিচুকনি গীত, বিয়েতে গাওয়া হয় বিয়াগীত, এ-রকম অনেক আছে। অনুবাদ করতে পারেন।

আপনার কথাও জিগ্যেস করেছিলেন, চিনি কি না। আপনি যে অসমিয়া কবিতা অনুবাদের জন্যে কাজ করেছেন, বললেন। নির্ভুল উচ্চারণে স্পষ্ট ও ঝকঝকে বাংলা বলেন হীরুদা। দারুণ কবিতা লেখেন। আগেও গুয়াহাটিতে মালিগাঁও-এ হীরুদার সঙ্গে কয়েকবার দেখা হয়েছে। প্রাণখোলা দিলদরিয়া, সুপণ্ডিত মানুষ।

আপনার পূর্বপুরুষ পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ অসমিয়া আর বাঙালিকে এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে টেনে এনে পরস্পরকে ভালোবাসতে, শ্রদ্ধা করতে শিখিয়েছিলেন, আপনিও সে-কাজেরই একটা ধারায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন এটা খুবই আনন্দের কথা। আমার অসমিয়া ভাষার জ্ঞান খুব সামান্য। অনুবাদ করতে গেলে যা-তা কাণ্ড হয়ে যাবে। আপনি যে ভালো করে ভাষাটা শিখে নিয়ে কবি-লেখকদের সঙ্গে, অভিধানের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন এ-জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন। ইতি

উদয়ন ঘোষ

(৭)

অতি সমৃদ্ধ

পরমপ্রিয় রমানাথ,

ভাই, তোমার প্রেরিত 'পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ও রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি পুরস্কার, ২০১১', যা রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই থেকে প্রকাশিত, পড়ে ফেললাম। অতি সমৃদ্ধ এই স্মারকগ্রন্থ।

অনেক কিছু জানবার, বোঝবার ও শেখবার আছে। প্রশান্ত চক্রবর্তী, শ্যামসুন্দর বসু, বীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়দের মূল্যবান প্রবন্ধ সমৃদ্ধ করেছে এই স্মৃতি-সংকলন। তোমার ও শ্যামাশিস-এর সবিনয় নিবেদন ও প্রাক্-কথন আমার ভালো লেগেছে। সুসম্পাদনা করেছেন সুকুমার বাগচি। সবাইকে আমার ধন্যবাদ ও নমস্কার জানাচ্ছি।

নির্মল বসাক

৭/৭/১২

২২/৩, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড,

কলকাতা-১৯

(৮)

এই প্রজন্মের অনুসন্ধান ও মনোনিবেশ দাবি করে

শ্রী রমানাথ ভট্টাচার্য 12.07.'12

প্রীতিভাজনেষু,

আশা করি কুশলে আছেন। প্রায় মাসাধিককাল হল আপনার প্রেরিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ ও রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি পুরস্কার, ২০১১ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ পেয়েছি। বিলম্বে প্রাপ্তিস্বীকারের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। এই সময়ে নানা পত্রপত্রিকার লেখালিখি ও ব্যক্তিগত কারণে উত্তর দিতে দেরি হল।

স্মারকগ্রন্থটি দুটি কারণে আমার নিকট মূল্যবান বিবেচিত হয়েছে। সেই দুটি হল— প্রশান্ত চক্রবর্তী রচিত প্রবন্ধ 'পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ : জীবন ও কর্ম'। দ্বিতীয় কারণ, কিশোর বয়েস থেকে রামনাথ বিশ্বাসের দ্বিচক্রযানে বিশ্ব-পরিক্রমা আমার কাছে পরম বিস্ময়ের হয়ে আছে। এ-ছাড়া তাঁর দুর্জয় সাহস ও 'ঘরকুনো ভেতো' বাঙালি অপবাদ দূর করার সংকল্প ও সফলতা, কোনোরকম অর্থকরী সাহায্য ছাড়াই মাত্র মনের জোরে ও অদম্য প্রয়াসে, বিশ্বের সমতুল্য কোনো দৃষ্টান্ত ছাড়াই এককভাবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। শ্রীহট্ট জেলার বানিয়াচঙের রাজবংশজাত সন্তান, পিতৃমাতৃহীন অবস্থাতেও, ধারাবাহিক অসুস্থতার মধ্যেও কীভাবে নিজেকে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মানুষ করে তুলেছিলেন, সে-ইতিহাস অনেকের মতো আমারও অজানা ছিল। স্মারকগ্রন্থটি পাঠে বিশদভাবে তাঁর জীবন ও কর্মের বৈচিত্র্য ও একাগ্রতা, স্বাদেশিকতা, বিরুদ্ধ পরিবেশকে জয় করা ইত্যাদি এ-যুগের কিশোর ও যুবকদের কাছে অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্তস্বরূপ হবে।

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এ-যুগে বিস্মৃতপ্রায় হলেও তাঁর মতো গবেষক ও পণ্ডিত প্রকৃতই বিরল। তাঁর বহুমুখী কর্ম ও সাফল্য, বিশেষ করে 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' গঠন, অসমে অসমিয়া-বাঙালি সাংস্কৃতিক মিলনের ক্ষেত্র রচনা, অবহেলিত অসমের ইতিহাস, ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার, সরকারি গুরুত্বপূর্ণ কাজের পাশাপাশি লুপ্তপ্রায় ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের পুনরুদ্ধার ইত্যাদি অজানা অনেক তথ্য সংবলিত রচনাটি এই প্রজন্মের অনুসন্ধান ও মনোনিবেশ দাবি করে।

আমি স্মারকগ্রন্থ পাঠে জেনে খুশি হলাম যে গবেষক পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ আপনার পূর্বপুরুষ এবং আপনি যথার্থভাবে তাঁর ও ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের স্মরণে আপনার নামাঙ্কিত ফাউন্ডেশনের সাহিত্য পুরস্কার প্রচলন করেছেন। এই মহৎ কর্ম অবশ্যই বাংলা তথা অসমিয়া সাহিত্য-সংস্কৃতিতে নবজাগরণ সৃষ্টি করবে। আপনার উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হোক।

অধিক কী, ভালো থাকুন, সৃষ্টিতে থাকুন।

শুভেচ্ছায় ও প্রীতিতে

মতি মুখোপাধ্যায়

দুর্গাপুর

(৯)

আলোচনা ইতিহাস-ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়, খণ্ডিত নয়

১৮, সার্কুলার পথ, রুক্মিণীনগর,
দিশপুর, গুয়াহাটি-৭৮১০০৬
১৩ ডিসেম্বর ২০১২

শ্রী শ্যামাশিস ভট্টাচার্য
সাধারণ সচিব
রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন
মুম্বাই-৪০০০৬৪।

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার এবং রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার, ২০১১ প্রদান উপলক্ষে রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই দ্বারা প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থটি বিষয়-বৈচিত্র্যে যেমন অনন্য তেমনই পরিচ্ছন্ন। সুকুমার বাগচির আন্তরিক সম্পাদনায় এমন একটি সুসজ্জিত ও সুমুদ্রিত স্মারকগ্রন্থ এতদঞ্চলের শিক্ষিত বাঙালি সমাজে নিঃসন্দেহে তথ্যসমৃদ্ধ আকরগ্রন্থের তালিকায় স্থান পাওয়ার যোগ্য।

'পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ : জীবন ও কর্ম' শীর্ষক প্রশান্ত চক্রবর্তীর রচনা থেকে শুরু করে শ্যামসুন্দর বসুর 'ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস-এর জীবন ও সাহিত্য' সহজ সরল ভাষায় তৎকালীন সময়ের বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছে। অন্যদিকে পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ স্মারক বক্তৃতা হিসেবে বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি-বিশেষজ্ঞ তথা গবেষক ড. বীরেন্দ্রনাথ দত্ত অসমিয়া লোকগীত প্রসঙ্গে গোয়ালপাড়িয়া লোকগীতের অবস্থান ও গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে যে-ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও লোকসংস্কৃতির দিকটিতে আলোকপাত করেছেন তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আমার মতে এই লেখাটি স্মারকগ্রন্থের মান ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে। ২০১১ সালের দুই পুরস্কার প্রাপক যথাক্রমে কবি হীরেন ভট্টাচার্য ও কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়-এর পরিচিতির পাশাপাশি ২০১০ সালের পুরস্কার বিজেতাদ্বয় যথাক্রমে কবি অজিৎ বরুয়া ও কবি বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের পরিচিতির পুনর্মুদ্রণের আদৌ প্রয়োজন ছিল কি না তা নিয়ে কিঞ্চিৎ সংশয় থেকে গেল। 'বানিয়াচঙের রাজবংশ : পরিবর্ধিত কুলপঞ্জি'র জন্য সংকলক রমানাথ ভট্টাচার্য সাধুবাদ পাবার যোগ্য। বিশেষত এ-ব্যাপারে কুলপঞ্জির শেষাংশে তিনি যে-বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন সেটিও বর্তমান গবেষকদের কাছে একটি মূল্যবান দলিল হয়ে থাকবে।

এমন একটি উচ্চমানের স্মারকগ্রন্থ সংকলনে যে-লেখাটি আমাকে সবচেয়ে বেশি পীড়িত ও আহত করেছে তা হল বরাক উপত্যকার বিশিষ্ট কবি বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের 'উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা কবিতা' শীর্ষক রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতাটি। সাতটি

পর্বে বিস্তৃত তেইশ পৃষ্ঠার সুদীর্ঘ আলোচনায় তিনি বিতর্কিত তৃতীয় ভুবনের প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে মূলত ত্রিপুরা ও বরাক উপত্যকার কবি ও কবিতার সপক্ষে ওকালতি করেছেন। সমগ্র বক্তব্যের কিছু অংশে যদিও মেঘালয়ের দুই প্রধান শহর শিলং ও তুরাকে ছুঁয়ে গেছেন, কিন্তু বৃহত্তর অসম বা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় দীর্ঘকাল ধরে যে-সব লিট্‌ল ম্যাগাজিন প্রকাশ ও কবিতাচর্চা চলেছে সে-সম্পর্কে কোনো আলোচনারই প্রয়োজন বোধ করেননি। অন্য একটি পত্রিকায় (গুয়াহাটির 'প্রাচী ধরিত্রী', শরৎ ১৩৯৭ অর্থাৎ ১৯৯০) প্রকাশিত ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার লিট্‌ল ম্যাগাজিনের তালিকা থেকে বিজিৎবাবু কয়েকটি পত্রিকার নাম উল্লেখ করেছেন মাত্র, কিন্তু ওইসব পত্রিকায় কারা কবিতা লিখেছেন, কেমন লিখেছেন সে-বিষয়ে তিনি সম্পূর্ণ নীরব (স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ৬১)। আবার, ওই পৃষ্ঠাতেই তিনি লিখেছেন, "একসময়... ডিব্রুগড়, যোরহাট, এমন-কি ডিগবয়ের নামও আসত", অথচ বিজিৎবাবুর সমগ্র আলোচনায় একমাত্র উর্ধ্বেন্দু দাশের নাম একাধিক বার উচ্চারিত হওয়া ছাড়া উজান অসমের অন্য কোনো কবির নামোল্লেখ নেই।

স্মারক বক্তৃতাটির দ্বিতীয় পর্বে বিজিৎবাবু বলেছেন, "...আমার আলোচনা সীমিত রাখতে চাই দেশবিভাগ-পরবর্তী কালের কথায়। আবার সীমাও টানছি গত শতাব্দীর শেষ, অর্থাৎ ২০০০ সাল পর্যন্ত।" খুব ভালো কথা, এমনটা হতেই পারে। কিন্তু তাঁর নিজের লেখা 'উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা সাহিত্য'-এর দুটি খণ্ড, যার পরিবর্ধিত সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে, সেই গ্রন্থের 'সংক্ষেপিত বক্তব্য' যদি এমনটি হয় তাহলে এমন সন্দেহ অমূলক নয় যে লেখক সুকৌশলে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবিতাচর্চার ইতিহাসকেই উপেক্ষা করেছেন, নতুবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এড়িয়ে গেছেন। কেননা, বিজিৎবাবুর মতো একজন বিশিষ্ট কবি, যিনি সুদীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে 'সাহিত্য' নামক একটি লিট্‌ল ম্যাগাজিন সম্পাদনা করে আসছেন এবং যার সুবাদে উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ পশ্চিমবঙ্গেও সুপরিচিত ও সমাদৃত, তেমন একজন বিদগ্ধ ব্যক্তির এমনতরো দায়সারা আলোচনা আমাদের বিস্মিত করে।

বিজিৎবাবু কি সত্যি সত্যি জানেন না, নাকি খোঁজ রাখেন না ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার ছোট কাগজ বা কবিদের কাব্যচর্চার? তাঁর জ্ঞাতার্থে জানাই— ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার অবিভক্ত গোয়ালপাড়া জেলায় সেই সত্তরের দশকের শেষের দিকে কলেজ-পড়ুয়া একদল তরুণ বিলাসীপাড়া শহর থেকে ট্যাবলয়েড আকারে একটি মাসিক সাহিত্যের কাগজ বের করেছিল 'ছায়াতরু' নামে। সৌভাগ্যক্রমে এটির সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলাম আমি। 'ছায়াতরু'র ১৩টি সংখ্যা প্রকাশ পেয়েছিল। তার পরে আশির দশকের গোড়ায় সাপটগ্রাম নামক মফস্‌সল শহর থেকে নির্মল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বের হয় 'সপ্তবার্তা'। সেটি সংবাদ-সাপ্তাহিক হলেও তার নিয়মিত সাহিত্য বিভাগটিও ছিল যথেষ্ট উন্নত এবং উক্ত পত্রিকায় গল্প-ফিচার ও প্রবন্ধের পাশাপাশি প্রচুর কবিতা ছাপা হত। ধুবড়ির 'সওয়ার' (১৯৮১) পত্রিকা তো তখন সরগরম। তারও আগে কোকরাঝাড় থেকে প্রকাশ পেতে শুরু করে 'প্রান্তিক'— নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের স্থানীয় মুখপত্র, একসময় যার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন কোকরাঝাড় কলেজের অধ্যাপক সুবোধ বাগচী। গৌরীপুরের 'প্রান্তবাসী'র কথাও উল্লেখযোগ্য। যদিও সেটি দ্বিভাষিক কাগজ, তবু ওইসব কাগজকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে লেখালিখির ঢেউ ওঠে। সেই স্রোতের ফসল গৌতম মিত্রের সম্পাদনায় 'শাঁখাতি', যা ১৯৮৬ সালে ফকিরাগ্রাম থেকে প্রকাশ পেতে শুরু করে। অন্যদিকে বাসুগাঁও থেকে 'সাগ্নিক' (১৯৮৬) ও পরে বঙাইগাঁও থেকে 'দিক ও দিগর' বের হয়। এইসব কাগজকে কেন্দ্র করে সমগ্র নামনি অসমে কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে নিরন্তর প্রয়াস লক্ষ করেছি আমরা, তারই ফলশ্রুতি হিসাবে গৌতম মিত্রের সম্পাদনায় 'নীল পাহাড়, লাল নদী' নামে একটি কাব্য-সংকলনও প্রকাশ পায়। অন্যদিকে, বর্ষীয়ান সাহিত্যিক ও গবেষক নারায়ণ সরকারের সম্পাদনায় ১৯৯৮ সালে গুয়াহাটি থেকে প্রকাশিত হয় 'লেখাকর্মী কবিতা সংকলন', এতে ২৪ জন কবির আশিটিরও বেশি কবিতা গ্রন্থিত হয়েছে। 'লেখাকর্মী'র ওই সংকলনটি কেবল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়ই নয়, উত্তরবঙ্গ, ত্রিপুরা ও বরাক উপত্যকায়ও সাড়া ফেলেছিল। সমবায়-ভিত্তিক এমন একটি প্রয়াসের অনুসরণ করে বরাকেও তখন একটি সংগঠন গড়ে উঠেছিল বলে খবরে প্রকাশ (অথচ বিজিৎবাবুর আলোচনায় কেবল কুমার অজিত দত্ত সম্পাদিত 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাংলা কবিতা' (১৯৮৩) শীর্ষক সংকলনটির নামই উল্লেখিত)। অনুরূপ দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় বৃহত্তর নগাঁও জেলায়ও। সেখানে 'সহযাত্রী', 'অংকুর' (১৯৮৪), 'ঐকতান' (১৯৮৬), 'সৃজন' (১৯৯৬), হোজাই থেকে 'নিরুণ' (১৯৯০), 'অনির্বাণ' (১৯৯২), লংকায় 'সাহিত্য সরণি' (১৯৮৩) এবং সর্বোপরি নগাঁও শহরের 'ব্রহ্মপুত্রে ভাসমান ভেলা' (১৯৯২) প্রভৃতি কাগজকে সামনে রেখে স্থানীয় কবি-সাহিত্যিকরা লেখালিখির চর্চা অব্যাহত রাখেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, যে-সব পত্রপত্রিকার নাম এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তার অধিকাংশই তো পাঁচমিশেলি কাগজ, শুধুই কবিতার পত্রিকা নয়। সত্যি কথাই। তবে স্বয়ং বিজিৎবাবুর 'সাহিত্য'ও তো শুধু কবিতার পত্রিকা নয়। তা ছাড়া তাঁর আলোচনায় যেহেতু শিলং থেকে প্রকাশিত বেণুমাধব গোস্বামী সম্পাদিত 'রুদ্রবীণা' এবং গুয়াহাটির 'একা এবং কয়েকজন' সহ আরও বেশ কয়েকটি এমন পত্রিকার নাম রয়েছে যেগুলো একান্তভাবে কবিতা-নির্ভর নয়, সেজন্যই এই তথ্যের অবতারণা। বিশেষত 'রুদ্রবীণা' তো কেবল গদ্যের কাগজ, যার মাত্র চারটি সংখ্যা বেরিয়েছিল।

আলোচ্য বক্তৃতায় (স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ৬১) বিজিৎবাবু লিখেছেন, "...শিলঙে চাকরিসূত্রে এলেন মৃণাল বসু চৌধুরী, 'দেশ' পত্রিকার উপর অভিমান করে 'দেশান্তর' নামে কবিতার পত্রিকা করলেন। তিনি সাহিত্যের সম্পাদনার সঙ্গেও যুক্ত হয়েছিলেন কিছুকাল। মৃণাল বদলি হয়ে যাওয়ার কিছুকাল পর এলেন শংকর চক্রবর্তী, তিনি প্রকাশ করলেন 'শতাব্দী' নামে কবিতার কাগজ।" মৃণাল বসু চৌধুরী 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও, অর্থাৎ ধরে নেওয়া যায় যে তিনি বিজিৎবাবুর যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিলেন, এই বক্তব্যের মধ্যে বেশ কয়েকটি তথ্যগত ভুল লক্ষ করা গেল। প্রথমত, 'দেশান্তর' ও 'শতাব্দী' দুটোই পুরোপুরি কবিতার পত্রিকা ছিল না, সেখানে গল্প সহ গদ্যরচনাও স্থান পেয়েছিল। দ্বিতীয়ত, মৃণাল 'দেশ' পত্রিকার উপর অভিমান করে 'দেশান্তর' বের করলেন— এই মন্তব্যেও একাধিক ভ্রান্তি লক্ষণীয়। 'দেশান্তর' প্রকাশিত হয়েছিল চারজনের যৌথ উদ্যোগ ও আর্থিক আনুকূল্যে, তাঁরা হলেন বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, সৌমেন সেন, সুকুমার বাগচি ও মৃণাল বসু চৌধুরী। পত্রিকাটির দুটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় এবং দুটো সংখ্যারই সম্পাদক ছিলেন সৌমেন সেন। তবে মৃণালও প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁর এক বন্ধুর মাধ্যমে পত্রিকাটি কলকাতা থেকে ছাপিয়ে আনার ব্যবস্থা তিনিই করতেন। তৃতীয়ত, পত্রিকাটির নামকরণের সঙ্গে 'দেশ' পত্রিকার ওপর অভিমানের বিষয়টিও বিজিৎবাবুর কষ্টকল্পিত। প্রকৃত তথ্য এই যে, 'দেশান্তর'-এর সঙ্গে যে-চারজন যুক্ত ছিলেন তাঁরা সকলেই তখন দেশান্তরী, শিলঙে তাঁদের কোনো স্থায়ী আস্তানা ছিল না, আর ইতিপূর্বে প্রকাশিত বীরেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থের নাম ছিল 'পরবাসী'— এই সব কিছু মিলিয়েই পত্রিকার নামকরণ করা হয়। কয়েক বছর আগে বীরেন্দ্রনাথ প্রয়াত হলেও বাকি তিনজন এখনও বহাল তবিয়তে রয়েছেন এবং তাঁরা বিজিৎবাবুর সুপরিচিত। তা সত্ত্বেও ভ্রান্ত তথ্য পেশ করার কারণ কী? চতুর্থত, "মৃণাল বদলি হয়ে যাওয়ার কিছুকাল পর এলেন শংকর চক্রবর্তী"— এই তথ্যও সম্পূর্ণ ভুল। আসল ঘটনা হল, শংকর শিলঙে আসেন ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে এবং [illegible] জুলাই মাসে এবং শিলং থেকে বদলি হন ১৯৭৩ সালে। অর্থাৎ মৃণালের শিলংবাসের পুরো সময়টাতেই শংকরও সেখানেই ছিলেন, পরে আসার প্রশ্নটাই অবান্তর। ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাসের নামাঙ্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মারক বক্তৃতায় অনুসন্ধানহীন এ-জাতীয় তরল মন্তব্য বিজিৎবাবুর (যিনি আগের বছর রামনাথ স্মৃতি পুরস্কারও পেয়েছেন) কাছ থেকে আদৌ আশা করা যায় কি?

সকলেই জানেন, ছোট কাগজ যেখান থেকেই প্রকাশ পাক-না কেন, সেই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে লেখালিখির একটা পরিমণ্ডল তৈরি হয়, ক্রমে তা আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। এ নিয়ে বিদ্বজ্জন মহলে গঠনমূলক আলোচনা-সমালোচনা যত বেশি হয় ততই সাহিত্যসেবীরা অনুপ্রাণিত হন এবং তাঁদের পরিচিতির পরিধি বৃদ্ধি পায়। এভাবেই বাংলা সাহিত্যে উঠে এসেছেন অসংখ্য সাহিত্যিক ও কবি। বিজিৎবাবুর লেখায়ও বরাক উপত্যকা, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের চিত্র প্রায় যথাযথ উঠে এসেছে। অথচ তাঁর প্রবন্ধে জামশেদপুর, মেদিনীপুর, কলকাতা ও উত্তরবঙ্গের প্রসঙ্গ থাকলেও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা কার্যত অনুপস্থিত।

ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বৃহত্তম শহর গুয়াহাটির কাব্যচর্চার বিষয়েও বিজিৎবাবুর উল্লেখ নামমাত্র। গুয়াহাটিতে "বাংলা কাব্যের আধুনিকতার ঢেউ" লাগার কথা বলতে গিয়েও তিনি নিজে সহ বরাকের কবিদের কথাই বলেছেন, যাঁরা তখন গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় বা গৌহাটি মেডিক্যাল কলেজে পড়ছিলেন, বলেছেন : "অতন্ত্রের একটা অংশ গুয়াহাটিতেও সক্রিয়।" (পৃ. ৫৯)। পরের পৃষ্ঠাতেও গুয়াহাটি প্রসঙ্গে বিজিৎবাবু এখান থেকে ১৯৭০-এর শেষার্ধে প্রকাশিত দুটি পত্রিকা ও তিনজন সম্পাদকের নামোল্লেখ করে বলেছেন, "হ্যাঁ, আজকের গবেষক, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক উষারঞ্জন [ভট্টাচার্য] তখন কবিতা লিখেছেন।" ব্যস, ওইটুকুই, উক্ত অনুচ্ছেদের মোট ছাব্বিশটি লাইনে এখানকার কবি বা কবিতা সম্পর্কিত আর একটি বাক্যও নেই।

আলোচ্য বক্তৃতায় গুয়াহাটির মোট চোদ্দটি ছোট পত্রিকার নাম উল্লেখ করেছেন বিজিৎবাবু। আমরা আরও কয়েকটি পত্রিকার নাম করতে পারি, কিন্তু এখানে তার প্রয়োজন নেই। আসল কথা হল, এইসব পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কবিতাচর্চার যে-ব্যাপক প্রভাব ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় দেখা দেয় তা কি বিজিৎবাবুর দৃষ্টিতে ধরা পড়েনি? না কি তিনি ধৃতরাষ্ট্রের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন স্বেচ্ছায়? নইলে কুমার অজিত দত্ত সম্পাদিত কবিতা-সংকলনের ভূমিকার অন্তর্ভুক্ত একটি উদ্ধৃতি ("পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি নাগাদ গৌহাটী থেকে সূর্য্য নামে একটি উচ্চমানের সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশিত হ'ত। পত্রিকাটির প্রকাশক ছিলেন নিখিল চক্রবর্তী। পত্রিকাটি কবিতা বিষয়ক না হলেও ঐ সময়কার বাংলা কবিতাচর্চার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল অবশ্যই। কালাচাঁদ চৌধুরী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, অমলেন্দু গুহ, বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, ভরত ঘোষ, নিখিল চক্রবর্তীর মতো শক্তিশালী কবিরা নিয়মিত কবিতা লিখতেন এই পত্রিকায়।" - পৃ. ৬২) দিয়েই তিনি দায়মুক্ত হতে চান কোন্ বিবেচনায়? তাঁর সুদীর্ঘ রচনায় বহু কবির বহু কবিতাংশ উদ্ধৃত হয়েছে, কিন্তু শুধু বীরেন্দ্রনাথ (ও ঊর্ধ্বেন্দু দাশ) ছাড়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আর একজন কবির একটি পঙ্‌ক্তিও স্থান পায়নি কেন? উদ্ধৃতিভুক্ত বাকি পাঁচজন "শক্তিশালী" কবিও বাদ গেলেন কেন? অধিকন্তু, বিজিৎবাবু নিজে যখন পরবর্তী অর্ধশতকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রায় ৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ বিস্তীর্ণ এলাকায় ওই দুজনের বাইরে অন্য কোনো কবিরই সন্ধান রাখেন না তখন তাঁর আলোচনার শিরোনামে 'উত্তর-পূর্ব ভারতে' যুক্ত হয় কোন্ যুক্তিতে?

বিজিৎবাবুর জ্ঞাতার্থে জানাই, কেবল ২০০০ সাল পর্যন্তই (যেহেতু তাঁর আলোচনার সীমা ওই সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট করা হয়েছে) যে-সব কবি এই উপত্যকায় উঠে এসেছেন এবং যাঁদের অধিকাংশ আজও কাব্যচর্চা অব্যাহত রেখেছেন তাঁরা হলেন : সুকুমার বাগচি, জীবন নাথ, প্রমোদরঞ্জন সাহা, সত্যেন চৌধুরী, রঞ্জন কর, রেণুকা বিশ্বাস, উমা ভৌমিক, অনিল দাশ পুরকায়স্থ, সঞ্জয় চক্রবর্তী, গৌতম মিত্র, অনন্ত ভট্টাচার্য, তুষারকান্তি সাহা, সমর দেব, বিকাশ সরকার, আরতি লাহিড়ী চক্রবর্তী, শিবাশিস চট্টোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র দাস, রতীশ দাশ, অসীমকুমার নন্দী, দিলীপ দাস, দেবেশ মিত্র, মঞ্জিতকুমার রায়, অসীম মিত্র, দীপিকা বিশ্বাস, সুশান্ত কর, নিখিল তালুকদার, শুভঙ্কর রায়চৌধুরী, কল্লোল ভৌমিক, মিহির মজুমদার, অনন্যা ভট্টাচার্য, অভিজিৎ চক্রবর্তী, চিন্ময়কুমার দাস প্রমুখ। এ-ছাড়াও প্রয়াত কবিদের মধ্যে রয়েছেন নন্দলাল সেনগুপ্ত, সুভাষ দে, প্রতীপ মুখোপাধ্যায় ও আশীষ শর্মা।

সুতরাং বিজিৎবাবুর আলোচনা প্রকৃতার্থে বরাক উপত্যকা, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ে সীমাবদ্ধ। তাও পুরোপুরি ঠিক নয়। কারণ সুকুমার বাগচি দীর্ঘকাল শিলঙে থাকার সময়ে 'দেশান্তর', 'ঋতুরঙ্গ', 'পাহাড়িয়া', 'শতাব্দী', 'উমিয়াম' প্রভৃতি পত্রিকায় একাধিকবার কবিতা লিখেছেন। অথচ বিজিৎবাবুর আলোচনায় তিনি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, উপরোক্ত কবিদের অনেককে নিয়ে কলকাতার 'উবুদশ' পত্রিকা (বর্ষ ১৯ সংখ্যা ৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬) 'ব্রহ্মপুত্র (অসম) উপত্যকায় বাংলা কবিতা ও কবি' শীর্ষক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে, অতিথি সম্পাদক ছিলেন প্রসূন বর্মন এবং সেখানে বাসব রায়ের লেখা 'ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কবি ও কবিতা' শিরোনামে একটি সুদীর্ঘ নিবন্ধ স্থান পেয়েছিল। সেইসঙ্গে 'কবিকল্প' (বইমেলা ২০১০) পত্রিকায় 'ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাংলা কবিতা : ভিন্নস্বাদের কথকতা' শীর্ষক প্রবন্ধে মানিক দাস সংশ্লিষ্ট কবিদের কাব্যচর্চার ক্ষেত্রটির পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন অসমের বাইরে।

আমার দেওয়া তালিকায় কিছু কবির নাম অনিচ্ছাকৃত ভাবে বাদ পড়ে যেতে পারে। তবে আমি তো চিঠি লিখতে বসেছি, বিজিৎবাবুর মতো দীর্ঘ প্রবন্ধ নয়। যাঁরা এই উপত্যকার বিভিন্ন শহর-মফস্‌সলে থিতু রয়েছেন এবং পত্রপত্রিকায় লেখালিখিও করছেন তাঁদের নিয়ে ভবিষ্যতে যদি ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কাব্যচর্চা সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয় তাহলে আমরা অবশ্যই উপকৃত হব। আমার বক্তব্য, 'উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলা কবিতা' ইতিহাস-ভিত্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়, খণ্ডিত নয়।

নমস্কার ও শুভেচ্ছান্তে

তুষারকান্তি সাহা

(১০)

সৎ থাকতে চেষ্টা করি

শ্রী শ্যামাশিস ভট্টাচার্য
সাধারণ সচিব
রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন, মুম্বাই।

সবিনয় নিবেদন,

তুষারকান্তি সাহার চিঠি।

না, প্রতিক্রিয়া জানাবার প্রয়োজন বোধ করছি না।

আমার লেখা অনেকের ভালো লাগে, কারও কারও ভালো লাগে না। পাঠকের ভালোমন্দ প্রতিক্রিয়া জানাবার স্বাধীনতা আছে। আমি সবই সমান সহজভাবে গ্রহণ করি। সবসময় নিজের লেখার প্রতি সৎ থাকতে চেষ্টা করি।

শুভেচ্ছান্তে
বিজিৎকুমার ভট্টাচার্য
২১শে ফেব্রুআরি ২০১৩
কলকাতা

মুম্বাইস্থিত রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশনের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

সম্প্রীতির বাতাবরণে রচিত এক নান্দনিক পরিবেশ

গুয়াহাটি থেকে সাংস্কৃতিক প্রতিবেদক

অসমের কোনো মঞ্চে একইসঙ্গে অসমিয়া ও বাঙালি কবিকে বড় মাপের সাহিত্য পুরস্কার প্রদানের প্রশংসনীয় বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে মুম্বাইস্থিত রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন। গত দু-বছরের মতো এবারও গুয়াহাটির বিবেকানন্দ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত এক গাম্ভীর্যপূর্ণ নান্দনিক অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ এবং ভূপর্যটক রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার দেওয়া হয় গত ১৭ মার্চ। এবার পদ্মনাথ স্মৃতি পুরস্কার পেলেন অসমিয়া কবি নীলমণি ফুকন এবং রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি পুরস্কার দেওয়া হয় বাংলাভাষার কবি তরুণ সান্যালকে। প্রতিটি পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫১,০০০ টাকা, সেইসঙ্গে ছিল একটি করে মানপত্র, সম্মান-স্মারক এবং পদ্মনাথ ও রামনাথের প্রতিকৃতি সংবলিত বিশেষভাবে প্রস্তুত সুদৃশ্য মুগার উত্তরীয়।

ফাউন্ডেশনটি মুম্বাইয়ে গঠিত হলেও রমানাথ ভট্টাচার্য নিজে বাংলা ভাষার একজন সুপরিচিত কবি ও অনুবাদক এবং তাঁর জীবনের সিংহভাগই কেটেছে অসম ও মেঘালয়ে। পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠানও তাই আয়োজিত হয়েছিল গুয়াহাটিতে, অন্যান্য বছরও এখানেই হবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। এবারও ফাউন্ডেশনের মুখ্য উপদেষ্টা তথা কবি-সাংবাদিক সুকুমার বাগচির সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান শুরু হয় মহাপুরুষ শংকরদেব রচিত বরগীত এবং রমানাথের এক পূর্বপুরুষ স্বামী চণ্ডিকানন্দের একটি বাংলা ভক্তিগীতের মাধ্যমে, গান দুটি পরিবেশন করেন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অসমের দুই বিখ্যাত শিল্পী যথাক্রমে মিতালি দে এবং বিভুরঞ্জন চৌধুরী।

স্বাগত ভাষণে ফাউন্ডেশনের সাধারণ সচিব তথা শকুন্তলম টেলিফিল্ম (মুম্বাই)-এর কর্ণধার শ্যামাশিস ভট্টাচার্য বলেন, "আমরা চাই, বাংলা ও অসমিয়া ভাষা-সংস্কৃতি হাতে হাত ধরে চলুক।" এর পর অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন ফাউন্ডেশন-সভাপতি রমানাথ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, তাঁদের দুই স্বনামধন্য পূর্বপুরুষ তথা অসমের কৃতী সন্তান পণ্ডিত পদ্মনাথ ও ভূপর্যটক রামনাথের স্মৃতিতে প্রতিবছর একজন অসমিয়া কবি এবং একজন বাংলাভাষার কবিকে তাঁদের জীবনব্যাপী সাহিত্যকৃতির জন্য পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তিন বছর আগে। সেই অনুযায়ী এবার তৃতীয় বছরের পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে ২০১২ সালের জন্য।

অনুষ্ঠানে পদ্মনাথ স্মারক বক্তৃতায় গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তী শ্রীমন্ত শংকরদেবের সমাজ-সংস্কার ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের বিষয়ে উল্লেখ করেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত মনোজ্ঞ ভাষণে অধ্যাপক চক্রবর্তী বলেন যে শংকরদেবের আন্দোলন শুধুই ধর্মীয় আন্দোলন ছিল না, তা ছিল প্রকৃতপক্ষে সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে-ওঠা এক জাতীয় নবজাগরণও। রামনাথ বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতায় কলকাতার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় আলোকপাত করেন গত শতকের চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতার স্বতন্ত্র ধারা সম্পর্কে। তিনি বলেন, সেই সময়ের কবিতায় প্রাণের স্পন্দন ছিল অকৃত্রিম; বিদ্রোহের বাণী, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সংকল্প, জবাফুলের মতো প্রভাত, দুরন্ত দুপুর, স্বর্ণাভ সন্ধ্যা কিংবা ভালোবাসার মধুর স্মৃতি সমস্তই তখনকার কবিতায় চিত্রময় হয়ে উঠেছিল। অনুষ্ঠান উপলক্ষে উক্ত দুটি বক্তৃতার পাঠ, বিদ্যাবিনোদ ও ভূপর্যটকের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ এ-যাবৎ পুরস্কৃত কবিদের পরিচিতি সংবলিত এবং সুকুমার বাগচি সম্পাদিত একটি দৃষ্টিনন্দন স্মারকগ্রন্থ উন্মোচন করেন বিশিষ্ট অসমিয়া কবি ভবেন বরুয়া। তিনি একইসঙ্গে অসমিয়া ও বাংলাভাষার কবিকে পুরস্কার প্রদান সম্পর্কিত ফাউন্ডেশনের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে এই ধরনের উদ্যোগ উভয় জনগোষ্ঠীর জন্যই ইতিবাচক বার্তা বহন করে।

পুরস্কার গ্রহণ করে কবি নীলমণি ফুকন ফাউন্ডেশন-সভাপতি রমানাথের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালীন হৃদ্যতার স্মৃতিচারণ করে বলেন, "রমানাথের অকৃত্রিম কবিতা-প্রীতির বিষয়ে আমি অবহিত, পক্ষান্তরে পদ্মনাথের পাণ্ডিত্য তথা বৈশিষ্ট্য ছাত্রাবস্থা থেকেই আমাকে আকর্ষণ করেছে। সে-কারণে, ইতিপূর্বে বহু সম্মান ও পুরস্কার পাওয়া সত্ত্বেও এই ফাউন্ডেশন-প্রদত্ত বিদ্যাবিনোদের নামাঙ্কিত পুরস্কার পেয়ে আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব করছি।" কলকাতা থেকে আগত অন্য পুরস্কৃত কবি তরুণ সান্যাল অল্প কথায় নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ফাউন্ডেশন কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানান সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য।

বিভুরঞ্জন চৌধুরী পরিবেশিত 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' সমাপ্তি সংগীতের পরে ছিল জলযোগের আয়োজন, যা আমন্ত্রিত অতিথিদের আন্তরিক ভাববিনিময়ের সুযোগ এনে দেয়। এবারকার অনুষ্ঠানেও সমাগত দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যে রাজ্যের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক, নাট্যকার-অভিনেতা ও সংগীতশিল্পীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়, যাঁদের মধ্যে শ্রীমতী সুব্রতা বরুয়া, কুলদাকুমার ভট্টাচার্য, অরুণ শর্মা, শ্রীমতী মুক্তি চৌধুরী, হরেকৃষ্ণ ডেকা, উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, পান্নালাল গোস্বামী, বিবেকানন্দ বসু, শ্রীমতী সুদীপ্তা বসু, পঙ্কজ ঠাকুর, সমীর তাঁতী, অনুভব তুলসী, আনিসুজ্জামান, বিপুলজ্যোতি শইকিয়া, তুষারকান্তি সাহা, সঞ্জয় চক্রবর্তী, শ্রীমতী অঞ্জলি সেনগুপ্ত, শ্রীমতী শতরূপা সান্যাল, শ্রীমতী মিতা চক্রবর্তী, রাজীব বরুয়া, আমিনুল হক, মদনগোপাল গোস্বামী, শিবশংকর দাস, শ্রীমতী লুতফা হানুম সেলিমা বেগম, কুশল ভট্টাচার্য, শান্তনু রায় চৌধুরি, এম. কামালুদ্দিন আহমেদ, শ্রীমতী নীলিমা ঠাকুরিয়া হক, সঞ্জয় গুপ্ত, বিমলেন্দু চক্রবর্তী, শ্রীমতী দেবযানী তরণ শর্মা, কুশল দত্ত, সজল পাল, কুমার অজিত দত্ত প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সম্প্রীতির বাতাবরণে এ ছিল এক নান্দনিক পরিবেশ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, যাঁদের নামাঙ্কিত সাহিত্য পুরস্কার দিচ্ছে রমানাথ ভট্টাচার্য ফাউন্ডেশন সেই পদ্মনাথ ও রামনাথ উভয়েই অবিভক্ত অসম রাজ্যে শ্রীহট্ট জেলায় হবিগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বানিয়াচঙের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পদ্মনাথের ছাত্রজীবন ছিল যথেষ্ট উজ্জ্বল এবং কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় তিনি গুয়াহাটির কটন কলেজে অধ্যাপনায় অতিবাহিত করেন, সেইসঙ্গে সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক গবেষণায় নিজ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। অসমের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ পদ্মনাথ প্রণীত 'কামরূপশাসনাবলী' বিশিষ্ট মর্যাদায় ভূষিত এবং তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় 'কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি' ('আসাম রিসার্চ সোসাইটি')। অন্যদিকে, রামনাথ বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকার সময়েই 'অনুশীলন সমিতি'র সদস্য হিসেবে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং পরবর্তীকালে সাইকেলে একাধিক বার চারটি মহাদেশ ভ্রমণ করেন; এটাই তাঁকে 'ভূপর্যটক' হিসেবে প্রসিদ্ধি দেয়, সেইসঙ্গে তাঁর বিশ্বপর্যটনের অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ তিরিশটিরও বেশি ভ্রমণকাহিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে।